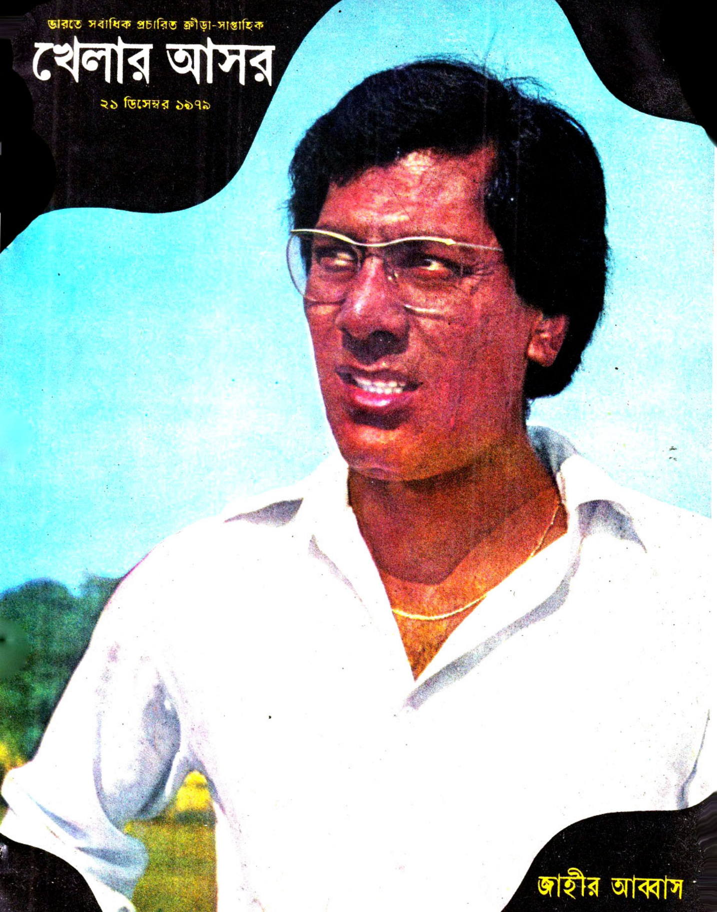
ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

২১ ডিসেম্বর ১৯৭৯



জাহীর আব্বাস



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



শিবলাল যাদব/শংকর নাগ দাস

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

বর্ষ ৩ ॥ সংখ্যা ৩১ ॥ ২১ ডিসেম্বর ১৯৭৯

এশিয়ান গেমস যে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াতে পারে এ আশঙ্কা আমরা আগেই করেছিলাম। প্রধানমন্ত্রী চরণ সিং নানা জায়গায় যেসব মন্তব্য করেছেন তাতে একটা জিনিস অবশ্য স্পষ্ট যে তিনি গেমস অনুষ্ঠানের ব্যাপারটাই পছন্দ করছেন না। এককথায় নীতির দিক দিয়ে তিনি বিরোধী এই কথাটাই সকলকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন।

তবে এই মনোভাব যদি মোরারজী সরকারের মন্ত্রী হিসেবে প্রকাশ করতেন তবে আরো ভাল হত। গেমস অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ভারত সরকার যখন গ্রহণ করেছিলেন তখন চরণ সিং অর্থমন্ত্রী। অথচ টাকা পয়সার খরচ নিয়ে টুঁ শব্দ করলেন না। তবে যা দিন কাল তাতে ভারতে এখন সবই সম্ভব। 'আয়ারাম গয়ারামের' দেশে জনসাধারণ আর কি আশা করতে পারেন?

সম্পাদক ঃ অতুল মুখার্জি

শিল্প নির্দেশক ঃ নিতাই ঘোষ

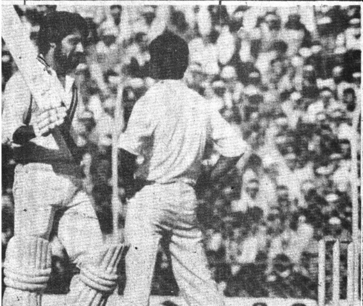
প্রতি সংখ্যা ঃ ১·৫০

বিমান মাশুল ঃ

পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা







যা আছে

ফুটবল ঃ

ক্রিকেট ঃ

অন্যান্য ঃ

প্রচ্ছদের ছবি তুলেছেন ঃ সন্তোষ ঘোষ।

অন্যান্য ছবি ঃ পাহাড়ী রায়চৌধুরী, সন্তোষ ঘোষ, লক্ষ্মণ পোদ্দার, তরুণ মুখার্জি, শঙ্কর নাগ দাস, কমল জুলকা প্রমুখ।



কোয়েম্বাটুরে ছত্রিশতম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

নেহরু স্টেডিয়াম(কোয়েম্বাটুর)থেকে দিলীপ সরকার



গোয়ার কোচ রঙ্গা

পাহাড় ঘেরা ছিমছাম কোয়েম্বাটুর এখন গোটা তামিলনাড়ুর সবচেয়ে ব্যস্ত শহর। কলকারখানা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যস্ততার মধ্যেও সারা শহরটাই দারুণ টগবগে হয়ে উঠেছে ছত্রিশতম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ঘিরে। ভোর থেকেই প্রায় মেঘে ঢাকা এই শহরে সূর্য্য ডুবে যাবার বহু আগেই বিদ্যুতের বন্যায় থৈ থৈ। লোডশেডিং-এর দেখা মেলে না মুহূর্তের জন্যেও।

শহরের একদম মাঝখানে নেহরু স্টেডিয়াম। হ্যালোজেনের আলো কলকাতার মোহনবাগান মাঠের স্মৃতিকে ম্লান করে দেয়। কলকাতায় যে হ্যালোজেন বাল্ব আছে, এখানেও তাই। দুটোই ফিলিপস কোম্পানির তৈরি। ফিটিংসের গড়বড়েই এই তফাৎ।

জাতীয় ফুটবলের খেলা হচ্ছে প্রতিদিন দুটি করে। দুটো ম্যাচই হয় অফিস ছুটির পর। সন্ধ্যে পাঁচটা ও সাতটায়। প্রাথমিক পর্বের লিগ ম্যাচ থেকেই প্রতিদিন স্টেডিয়াম থাকে প্রায় দর্শকে ঠাসা।

টপ ফেভারিট বাংলা

চারবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলাকে নিয়ে গুজব গুঞ্জন চারদিকে। দু'বছর আগে ফেডারেশন কাপের খেলায় মোহনবাগান দল এই এখনকার দর্শকদের বাংলার ফুটবল সম্পর্কে মাতিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। শোনা যায় ৮ ডিসেম্বর বাংলার ফুটবলারেরা শহরে পৌছবার সংবাদ রটতেই দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত স্টেডিয়ামের আনাচে কানাচে ভিড় জমিয়েছিল কয়েক হাজার ফুটবল পাগল—যদি একবারটি 'বেঙ্গল স্টারদের' চোখে দেখা যায়। ১১ ডিসেম্বর বাংলা প্রথম খেলবে। তার আগেই তারা দু'দিন প্র্যাকটিস করেছে স্থানীয় এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির সংলগ্ন মাঠে। মাঠ সমস্যায় এখানে সব রাজ্যই ভুগেছে। প্র্যাকটিসের বড়ই অভাব। স্টেডিয়ামেও প্র্যাকটিস করা নিষেধ। স্টেডিয়ামের মাঠ গোড়ায় ছিল সুন্দর সবুজ ঘাসে মোড়া। প্রতিযোগিতা শুরু হবার আগে প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়ায় মাঠে জল জমে গিয়েছিল হাঁটু সমান। কিন্তু দিন কয়েক খেলা হবার পর এখন মাঠ দেখতে হয়েছে ঠিক ধানকাটা ক্ষেতের মতো। নীচে আছে শক্ত পাথুরে মাটি। বল যথেষ্ট বাউন্স করছে। গ্রুপ লিগে বাংলার কোন অসুবিধে হবে না—এটা ধ্রুব সত্য। গতবারের রানার্স আপ গোয়ার দিকে অনেকে তাকিয়ে ছিল দ্বিতীয় ফেভারিট দল মনে করে। কিন্তু এবারের গোয়া দল তেমন শক্তিশালী নয়। ওদের ফরোয়ার্ডরা সহজেই বেতাল হয়ে যান অল্প শক্তিধর ডিফেণ্ডারদের কাছে। গোয়ার সেরা খেলোয়াড় ফ্রান্সিস ডি'সুজা মোহনবাগানে এবং ম্যাচাডো খেলবেন ইস্টবেঙ্গলে—পাকা হয়ে আছে। তবে ম্যাচাডোর ক্লাব (গোয়ার) কিছু ঝামেলা করছে এবং আরো করবে বলেও আঁচ পাওয়া গেছে তার ক্লিয়ারেন্সের ব্যাপারে।

গোয়ার কোচ রঙ্গা বললেন, দিলীপ, শ্রীনগরে যা দেখেছো, আমার এবারের দলে তার চল্লিশভাগ শক্তি নেই। শুধু ফ্রান্সিস আর ম্যাচাডো নেই, তাতেই এটা ঘটেনি। এ্যান্থনি জোয়াও গত নভেম্বরে বিয়ে করায় দলে আসতে পারেননি। প্রকাশের বাবা মারা গেছেন গত নভেম্বরে। ভারী ভালো প্লেয়ার, তবে এ অবস্থায় ওর কাছ থেকে তেজে খেলা কেমন করে আশা করি? আমরা কোয়েম্বাটুরের জন্য গোয়া ত্যাগ করেছি ৪ তারিখে। তিন তারিখ দিগম্বরের মা মারা গেলেন, ফলে দল হারালো একজন ভালো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে। এ্যানড্রু দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু টাইফয়েডে তিনি আক্রান্ত হলেন। গোয়ার হয়ে প্রথম খেলছেন ভ্যালেণ্টাইন অশোক প্যাটেল, গোকুল দাস। সুতরাং গোয়ার এমন অবস্থায় এবারের প্রতিযোগিতায় বাংলার পরেই দ্বিতীয় ফেভারিট-কে—তাই নিয়ে নানা জিজ্ঞাসার ছড়াছড়ি। প্রাথমিক পর্বের খেলা শেষ না হলে সেটা পরিষ্কার হবে না। প্রচণ্ড শক্তিতে ভরপুর কেরালা দলটি যে কোয়েম্বাটুর মাতাবে তা এখনই বলা যায়।

১০.১২.৭৯



অন্ধ্র : সিকিম—মজাম্দর ও প্রেমদোরজী মাটিতে। বল সিকিমের গোলরক্ষকের হাতে

বাংলার পক্ষে দর্শকেরা

এখানকার দর্শকরা ভালো ফুটবল সমঝদার। তারা চান ভালো, পরিষ্কার ফুটবল খেলা। দুম করে বডি-প্লে বা হাতাহাতি তারা সম্ভবত বরদাস্ত করেন না। উত্তর ভারতের কোথাও (যেমন জলন্ধরে বা গত বছর শ্রীনগরে) জাতীয় ফুটবলের আসর বসলে যেমন একটা বাংলা-বিরোধী জোট গড়ে ওঠে বারবার, তেমন দক্ষিণে হবার উপায় নেই। কিছুদিন আগে ত্রিচুর আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় দর্শকদের একটা অদ্ভুত আচরণ দেখা গিয়েছিল। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন খেলোয়াড় খেলা চলাকালীন অহেতুক লাথি ছুঁড়েছিলেন একজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়কে। দর্শকরা এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বেধড়ক পিটিয়েছিলেন স্থানীয় খেলোয়াড়টিকেই। ফেয়ার-প্লে হলেই দর্শকরা খুশীতে ডগমগ হন।

তাছাড়া এবারের সন্তোষ ট্রফির খেলার পরেই হবে এ আই এফ এফ-এর নির্বাচন। বাংলার অশোক ঘোষের পক্ষে আছেন দক্ষিণের বহু রাজ্য। ভয়ঙ্কর চালাক লোক তামিলনাড়ু থেকে এ আই এফ এফ-এ নির্বাচিত সহ-সভাপতি এন ভিট্টল। তার সাফ কথা, 'এবারের প্রতিযোগিতায় কোনরকম কারচুপি আমরা হতে দেবো না।' শক্ত হাতে সবকিছুর তদারকি করছেন ভিট্টল সাহেব।

আমিন সাহেবের শেষ ইচ্ছা সিঙ্গাপুর ভ্রমণ

নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি নুরুল আমিন কোয়েম্বাটুর এসেছিলেন ছত্রিশতম জাতীয় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করতে। ছিলেন এক সপ্তাহ। তারপর হালচাল বুঝে উড়ে গেছেন বাঙ্গালোরে, যেখানে আছেন ফেডারেশনের সম্পাদক বিজয়রঙ্গম। ১০ ডিসেম্বরের খবর, আমিন বাঙ্গালোর থেকে দিল্লি এবং পরে বোম্বে যাবেন জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে। জিয়াউদ্দিন এবারে ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট পদটি হাতিয়ে নিতে চান।

কথা ছিল এই ডিসেম্বরে এ আই এফ এফ-এর নির্বাচন হবে। দিল্লির বিবদমান দুই পক্ষের এক তরফের ঠুকে দেওয়া ফেডারেশনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে নিষেধাজ্ঞা জারির ব্যাপারটা তুলে নেওয়া হবে। পাকা কথা হয়েছিল শ্রীনগর ন্যাশনালেও। কিন্তু একটা বছর পার হলেও ফেডারেশনের অদৃশ্য আঙুলের নির্দেশে দিল্লির কর্তারা সিদ্ধান্ত পাল্টাননি। এদিকে জিয়াউদ্দিনের সমর্থন পেয়ে আই এফ এর অশোক ঘোষ তার পক্ষে জড়ো করেছেন অনেক রাজ্য সংস্থার ভোট। বিপাকে পড়ে আমিন গোষ্ঠী বাগড়া তুললেন যে ডিসেম্বরের নির্বাচন হতে পারবে না। কারণ এম দত্ত রায় সরাসরি গাইড লাইনের খপ্পরে পড়ে ফেডারেশনের কর্তৃত্ব ছেড়েছিলেন চার বছর আগে মার্চ মাসে। সুতরাং নতুন নির্বাচন হবে মার্চ এপ্রিলেই।

এইভাবে গত চার বছরে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির একমাত্র কেয়ারটেকার নুরুল আমিন ও তার সাকরেদরা আরো একবার আইনের মারপ্যাঁচে বাঁকা হাসি ছুঁড়ে দেবার সুযোগ করে নিলেন।

গত চার বছরে নুরুল আমিন নিজে এবং তার ভক্তদের বার ছয়েক বিদেশ সফরের সুযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন। সিঙ্গাপুরের প্রি-ওলিম্পিক ফুটবল উপলক্ষে শেষবারের মতো তারা ফেডারেশনের পয়সায় বিদেশ সফরটা সেরে নিতে চান বলে এতো সব আইনের কচকচি।

রাজ্যে আলাদা ফুটবল সংস্থা গড়তে মদত দিচ্ছে ফেডারেশন কর্তারা

এই যে দিল্লির কর্তারা গত দুই বছর কোর্টে হাজির হচ্ছেন, তা কিন্তু এ আই এফ এফ-এর সভাপতির কাজকর্মের বিরুদ্ধেই। অথচ অবাক হতে হল, আমিন সাহেব নিজের চেয়ারটি ফের কব্জা করার জন্য তার বিরুদ্ধবাদীদেরই মদত দিয়ে আসছেন।

গত বছর দিল্লির দুটি অ্যাসোসিয়েশন দুটি দল নিয়ে হাজির হয়েছিল শ্রীনগর ন্যাশনালে। শেষমেশ তাদের বুঝিয়ে সুজিয়ে একটি দলে সামিল করে খেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং ওখানেই চুক্তি হয়েছিল ঠুকে দেওয়া মামলা তুলে নেওয়া হবে। কিন্তু গদি হারাবার ভয়ে তাদেরকেই মদত দিয়ে চলেছেন স্বার্থান্বেষীরা।

এবারেও কোয়েম্বাটুরে হাজির হয়েছিলেন দিল্লির দুটি গোষ্ঠী দুটি দল নিয়ে। জাতীয় ফুটবলের আসরে যোগ দেবার আগে অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশনের নিয়ম আছে—অংশগ্রহণেচ্ছু রাজ্য অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে রেলওয়ে কনসেশন ফর্ম পাঠিয়ে দেবার। এই চালু নিয়মের সুযোগটা কাজে লাগিয়ে ফেডারেশন এবারেও দিল্লিকে পাঠিয়েছিলেন দুটি রেলওয়ে কনসেশন ফর্ম।

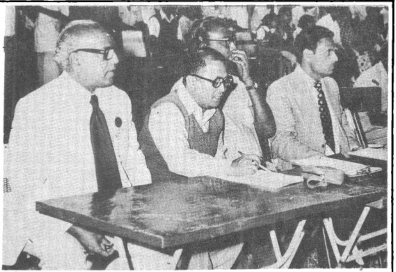
শুধু দিল্লিই নয়, এবছর দুটো দুটো করে কনসেশন ফর্ম পাঠানো হয়েছিল রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশকেও। তিনটি রাজ্যই কোয়েম্বাটুরে হাজির হয়েছিল দুটি করে দল নিয়ে। ফেডারেশন অনুমোদিত পুরানো সংস্থাকে ডিঙিয়ে নতুন গড়া পাল্টা সংস্থাকে কেন রেলওয়ে কনসেশন ফর্ম দেওয়া হল? ফেডারেশন কর্তাদের নিজেদের আখের গুছোবার জন্যই।

১১.১২.৭৯



অঙ্কের রাইট উইংগার কাইজারকে রুখছেন সিকিমের স্টপার গ্যাসেটো লেপচা

সন্তোষ ট্রফির আসরে উপস্থিত একমাত্র নির্বাচক আহমেদ হোসেন (ডান দিকে)।
— বাঁ দিকে প্রথম এন ভিট্টল



অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনে ভাঙন আসছে

দিন যত ঘনিয়ে আসছে নতুন নির্বাচনের, ততই যেন এ আই এফ এফ কর্মকর্তাদের ব্যস্ততা বাড়ছে নিজ নিজ আখের গুছিয়ে নেবার। গোটা দেশেই ফুটবলের জনপ্রিয়তা বাড়ছে ক্রমাগত, তীব্র গতিতে। অনেকেই চাইছেন এই সুযোগটা ব্যবহার করে ব্যক্তিগত-ভাবে জনপ্রিয় হতে, সামনের সারিতে চলে আসতে।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও দিল্লিতে রাজ্য ফুটবল সংস্থা নিয়ে চলছে কাজিয়া। মহারাষ্ট্রের বৃদ্ধ জিয়ায়ুদ্দিন আগামীতে এ আই এফ এফের সভাপতি পদের জন্য নুরুল আমিনের প্রতিদ্বন্দ্বী। সাময়িকভাবে জোড়াতালি দিয়ে রাজ্যের কাজিয়া জিয়ায়ুদ্দিন বন্ধ করেছেন। কিন্তু রাজ্য দলটি এতে কাবু হয়ে গেছে। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলার পরেই মহারাষ্ট্র এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশীবার ফাইনালে খেলার নজির রেখেছে। গত কয়েকবছর ধরে সন্তোষ ট্রফিতে দাপিয়ে এলেও এবার মহারাষ্ট্রকে প্রাথমিক পর্বের গ্রুপ লিগ থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে। 'সি' গ্রুপে সিকিমকে হারালেও ০-১ হেরেছে অন্ধ্রপ্রদেশের কাছে। গ্রুপের শেষ খেলায় দিল্লির বিরুদ্ধে জয়ী হলেও মহারাষ্ট্রকে প্রতি-যোগিতা থেকে বিদায় নিতে হবেই। জাতীয় আসরের জন্য দল গড়ায় বিভিন্ন গোষ্ঠীকে খুশী রাখতেই মহারাষ্ট্রের এমন দশা।

ভাস্কর গাইতি ছিলেন কলকাতা ও শ্রীনগরের জাতীয় আসরে মহারাষ্ট্রের এক নম্বর গোলকিপার। ভালো পারফর্মেন্সের জন্য তিনি ভারতীয় দলেও নির্বাচিত হয়েছিলেন, এবং খেলেছিলেন ব্যাঙ্কক এশিয়াডে। কিন্তু মফৎলাল ছেড়ে তিনি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশ-নের চাকরি নেওয়াতেই যত বিপত্তি। ভাস্কর হয়ে গেলেন রাজ্যের দু' নম্বর গোলকিপার বিন্দের পরে। মফৎলালের কোটা বজায় রাখতেই ভাস্করের ভাগ্যে এই বিপত্তি।

বোম্বাই রাজ্যের নিষ্পত্তি হলেও এই ন্যাশনালের আগে ফেডারেশনের তরফে রাজ্যে রাজ্যে সার্কুলার গিয়েছিল, এই ডিসেম্বরে ফেডারেশনের নির্বাচন হবে।

চেয়ার হারাবার ভয়ে তাই রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশকে উসকে দেওয়া হল রাজ্যে দুটি করে অ্যাসোসিয়েশন গড়ার জন্য। এইভাবে অদূর ভবিষ্যতে অল.ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন দু'ভাগ হলে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হবার নেই।

ভারতীয় ফুটবলে এবারের ন্যাশনালের গুরুত্ব অনেক

কোয়েম্বাটুরের এই ন্যাশনালের পরে মার্চ এপ্রিলে সিঙ্গাপুরে ভারত প্রি-ওলিম্পিকে খেলবে। অন্যান্য বছরের চেয়ে এবারে ভারতীয় দলের প্রস্তুতির রকম-সকম একটু ভাল। দীর্ঘদিন ধরে তিন ডজন সম্ভাব্য খেলোয়াড় বেছে নিয়ে পাতিয়ালায় ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্য থেকে একটি দল বেছে নিয়ে সম্প্রতি আরব দেশ সফর করে ভারতীয় দল ভাল ফল করে এসেছে। এই ন্যাশনাল শেষে আরও কয়েকজনকে বাছাই করে দ্বিতীয় দফার ক্যাম্প হবে ব্যাঙ্গালোরে।

ফেডারেশনের নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে আবার সেই একজনই—আমেদ হোসেন রোজই খেলা দেখছেন নেহরু স্টেডিয়ামের নির্দিষ্ট আসনে বসে। নির্বাচকদের জন্য সাজানো অন্যান্য আসনে এখনো (১১ ডিসেম্বর) অন্য দুটি মুখ অজিজুদ্দিন ও আবদুল্লার দেখা মেলেনি।

এখানে জড়ো হওয়া সারা দেশের ফুটবল বিশেষজ্ঞদের অনেকেই একমত যে ফ্লাড-লাইট ফুটবলে' খেলোয়াড়দের সঠিক গুণ-দোষ বিচার করা বড়ই মুস্কিলের ব্যাপার। ভারতীয় ফুটবলাররা এখনও ফ্লাড-লাইটে খেলতে অভ্যস্ত নন। কোচেরা মনে করেন খাদ্যের গুণাগুণের উপর খেলোয়াড়দের ভালো খেলা নির্ভর করে। এর আগে বেশির ভাগ ন্যাশনাল হতো দিনের আলোয়। সন্ধ্যায় এবং রাতে খেলাটা সম্পূর্ণ অনভ্যাসের ব্যাপার। খেলা যখন বিরতি তখন অনেক খেলোয়াড়ের রাতের খাবারের সময়। যখন খেলা শেষ হয় সেই সময় তো অনেকেরই বিছানায় ঘুমোতে যাবার অভ্যাস।

ব্যাঙ্গালোর এন আই এস এর এক ছাত্র ভারতের ফুটবল খেলোয়াড়দের নিয়ে এক গবেষণা করে জানালেন যে, 'তারা নৈশ ফুটবলের সময় স্বাভাবিক তৎপরতা থেকে কিছু ঘাটতিতে ভোগেন। সূর্যালোকের অভাবে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পেশী যথোচিত কাজ না করায় তাদের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়ে যায়।

ছবি : লক্ষ্মণ পোদ্দার



'আবার মিলে মিশে খেলা হোক—' দিল্লির কর্তারা বোঝাচ্ছেন দুই গোষ্ঠির খেলোয়াড়দের

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে কি অ্যাড-হক কমিটি ? দুই পক্ষ কি বলছেন

সংবাদদাতা ঃ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে ডাঃ নৃপেন দাসের অনুগামীরূপে চিহ্নিত কিছু সদস্য বর্তমানের পরিচালকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে রীতিমত বিক্ষুব্ধ। বিভিন্ন অভিযোগের দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি তারা সাতাশে নভেম্বর ক্লাব অফিসে পেশ করেছেন। যে সন্ধ্যায় বিক্ষুব্ধ সদস্যরা ওই চিঠি দিতে ক্লাব তাঁবুতে গিয়েছিলেন, তখন সেখানে পরিচালকমণ্ডলীর ঊষাবাবু, সুধাময়বাবু সহ আরও কয়েকজন ছিলেন। উভয় পক্ষের নির্বিকার কুশল বিনিময় এবং বাক্যালাপ শুনলে মনে করা কঠিন যে এরা বিদ্যমান দুটি বিরোধীগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। ক্লাব অফিসে চিঠি জমা দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসার পর স্মারকলিপির অন্যতম স্বাক্ষরকারী জীবন চক্রবর্তী জানান. 'অভিযোগ কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, ক্লাব চালানোর ব্যাপারে তাদের নীতির বিরুদ্ধে লড়াই। তাই পরস্পরের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।'

যদিও আশি সালের শেষে ক্লাবের পরবর্তী নির্বাচন হওয়ার কথা, কিন্তু বিক্ষুব্ধগোষ্ঠী তার আগেই অকর্মণ্যতা এবং অযোগ্যতার অভিযোগ তুলেছেন বর্তমানে ক্ষমতাসীন ক্লাব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ওরা চান অ্যাডহক কমিটি। এরজন্য সাধারণ সম্পাদকের কাছে তলবী সভা ডাকার সনদ পেশ করা হল। স্মারকলিপিতে ৯৭৯ জন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে সিধু দত্ত, হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দেবদত্ত ভট্টাচার্য, মোহনলাল সেন, জীবন চক্রবর্তী, দীপক দাস (পল্টু) প্রমুখ রয়েছেন।

পর পর দু'বছর প্রথম ডিভিসন ফুটবল লিগ, শিল্ড এবং বাইরের টুর্নামেন্টে ক্লাবের ব্যর্থতাই বিক্ষুব্ধগোষ্ঠীর মূল অভিযোগ। অভিযোগে বলা হয়েছে—কর্মকর্তাদের দলীয় বিভেদ, কর্মকর্তাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্যের ঘাটতি খেলোয়াড়দেরও দলপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশ হয়েছে এইসব ঘটনা।

তলবী সভার পক্ষে আরও বলা হয়েছে, বহুজনের মিলিত উদ্যোগে গড়া ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বর্তমানে ব্যক্তিগত স্বার্থের কেন্দ্র। বিভিন্ন সময়ে বিভাগীয় সম্পাদকদের অকারণে অপমানিত এবং ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। বহু সময়ে সংবিধানের আইনগুলি নিজেদের সুবিধা মাফিক ব্যাখ্যা করেছেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গড়া ক্লাবের কার্যকরী সমিতি সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির কুক্ষিগত হয়ে নিতান্তই অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন মাত্র।

ক্লাবের এই দুর্দিনে বিক্ষুব্ধগোষ্ঠী মনে করেন, ক্লাবে নেতৃত্ব সঙ্কট চলেছে। তদুপরি এই অযোগ্য কর্মকর্তারা আরও কিছুকাল ক্লাবের পরিচালন ব্যবস্থায় বহাল থাকলে ক্লাবের মর্যাদাহানির সঙ্গে ক্লাবের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে বাঁচাতে এবং হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে এই ৯৭৯ জন সদস্য চান—যতদিন পর্যন্ত নির্বাচনের সময় না হয় এই কমিটিকে ভেঙে দিয়ে সভাপতি থেকে শুরু করে বিভাগীয় সম্পাদক এবং কার্যকরী সমিতি গড়তে ২৬ জন সদস্য নিয়ে একটি অ্যাডহক কমিটি গড়া হোক।

বিরোধীগোষ্ঠীর কোমর বাঁধার খবর ক্লাবের বর্তমান কর্মকর্তারা সম্ভবত আগেই জেনেছিলেন। কারণ তার আগের দিন নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফাইনাল দেখতে গিয়ে বিক্ষুব্ধগোষ্ঠীর দুই প্রথম সারির সদস্য ক্লাবের বর্তমান কর্মসমিতির একজন সদস্যের (যিনি পুলিশের একজন পদস্থ অফিসার) পাল্লায় পড়েছিলেন। পুলিশ অফিসার ওই ভদ্রলোক প্রথমেই কমিটি মিটিং-এ হরিপদ দাসের মাথা ফাটার ঘটনার উল্লেখ করে বিরোধী দুই সদস্যকে শাসিয়ে উঠলেন, 'আজকাল এইসব মাথা ফাটাফাটি করা হচ্ছে নাকি! এর ফল কিন্তু ভাল হবে না।' পরক্ষণেই আবার তিনি প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার নৃপেন দাসের উদ্দেশ্যে কিছু মন্তব্য করেন। বচসা হয়ত আরও কিছুটা বাড়তো যদি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এই ঘটনার সাক্ষী না হতেন। এবং তার সামনে এ সমস্ত আলোচনা বন্ধ করার অনুরোধ একজন বিরোধী সদস্য না করতেন।

এই প্রসঙ্গে ডাক্তার নৃপেন দাস জনান্তিকে বলেছেন 'আমার জন্যেই তোরা আজ ক্লাব ছাড়া। তোদের মুখগুলো দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। তোদের জন্যই আমাকে আর একবার ক্লাবে যেতে হবে। না হলে আমার যা শরীরের অবস্থা আমি আর আগের মত খাটতে পারব না। তবুও যাব আর একবার। তারপর তোদের ভাল করে বসিয়ে দিয়ে আমার ছুটি।'



বর্তমান কমিটির যারা বিরোধী তাদের সবার আগে ডাঃ নৃপেন দাস / শংকর

ইস্টবেঙ্গলের বিজয়া সম্মিলনীতে সমর্থকরা এসেছেন দলকে ভালবেসেই / শংকর





এদিকে বর্তমান কর্মসমিতি নাকি প্রাক্তন ফুটবল সম্পাদক অজয় শ্রীমানীকে অধিক ক্ষমতা দিয়ে এ বছরের ফুটবল টিম গড়তে চান। অজয়বাবু কর্মতৎপরতা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন। কিছু প্লেয়ারের সঙ্গে তিনি কয়েকবার নাকি যোগাযোগ করেছেন। তবে তিনি নাকি শক্ত সমর্থ দল গড়তে ক্লাবের দুই বিখ্যাত স্কাউট-কে সঙ্গে পেতে চান। সুরজিতসহ আরও কিছু প্লেয়ার নাকি আগামী বছর ইস্টবেঙ্গলে থাকতে একেবারেই অনিচ্ছুক। তাদের ধরে রাখতে তাদের সঙ্গে 'মিষ্টি সম্পর্কের' কিছু লোককে সঙ্গে পেতে চান অজয়বাবু।

তাই শেষ পর্যন্ত তলবী সভার মাধ্যমে দু'দলের মধ্যে একটা সমঝোতার আশা অনেকেই রাখেন। তবে সকলের সঙ্গে সকলের সম্পর্ক জলচল নয়। তাই ভাবনা মেলাতে চাইলেই মিলবে কিনা সন্দেহ!

বর্তমান পরিচালকমণ্ডলী কী বলেন

ডাক্তার নৃপেন দাসের শুভার্থীদের তলবী সভার প্রতিক্রিয়া জানার জন্য স্মারকলিপি পাওয়ার পর বর্তমান পরিচালকমণ্ডলীর এক ক্ষমতাশালী সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। ভদ্রলোক পরিষ্কার জানালেন, এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে আমরা অপারগ। বিরোধীদের চিঠির আইনগত ব্যাখ্যা করার জন্য বিশিষ্ট আইনজ্ঞের উপদেশ চাওয়া হয়েছে। কিছু সদস্য বিশেষ সাধারণ সভা তলব করতে চাইলেই সাধারণ সম্পাদক তাদের সেই দাবির কাছে নতি স্বীকার করতে সর্বদা বাধ্য নন। কারণ অভিযোগের যথার্থ ভিত্তি যদি না থাকে তলবী সভা কেন ডাকা হবে?

এই প্রসঙ্গে ভদ্রলোককে প্রশ্ন করেছিলাম যে, তেমন অবাস্তব কোনও অভিযোগ ওই চিঠিতে করা হয়েছে নাকি? উত্তরে তিনি জানালেন, 'এ বিষয়ে ঠিক এখনই কোনও কথা বলতে পারব না। প্রথমত, আইনজ্ঞের ব্যাখ্যা আমরা এখনও পাইনি। দ্বিতীয়ত, আইনগত ব্যাখ্যা হাতে আসার পর আমাদের কমিটি ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবে এবং তলবী সভার দাবিদারদের চিঠিরও জবাব দেওয়া হবে।'

এরপর জানান যে, 'ওই ৯৭৯ জন সদস্যের সই ঠিক আছে কিনা সেটাও আমাদের খুঁটিয়ে দেখতে হবে এবং তারজন্য কিছু সময় লাগবে। সইয়ের ব্যাপারে কোনও কারচুপি বা মেম্বারশিপ নম্বরের ভুল অবশ্যই তলবী সভা ডাকার ব্যাপারে আইনগত বাধা বলে গণ্য হবে। তবে সব কিছু ঠিক করে আগামী দু/তিন সপ্তাহের মধ্যেই ওদের চিঠির জবাব দেওয়া হবে।'

তারপর একান্ত সংগোপনে বললেন, 'চিঠিতে অনেক কিছু ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হয়েছে যা অত্যন্ত হাস্যকর। ব্যাপারটা কি জানেন, ক্লাবের সংবিধান অনুযায়ী মাত্র একশ সদস্য একজোট হয়ে তলবী সাধারণ সভা দাবি করতে পারেন কিন্তু তার ফলে যে বর্তমান কমিটি খারিজ হয়ে যাবে এমন কথা বলা যায় না। এর আগেও বিরোধী সদস্যরা ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে বিশেষ সাধারণ সভা ডাকার দাবি জানিয়েছিলেন, সভা ডাকাও হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরোধীরা উদ্দেশ্যে সফল হতে পারেননি। ক'টা দিন সবুর করুন, সবই জানতে পারবেন।'

অপর এক কমিটি মেম্বারের মুখে পারস্পরিক সমঝোতার আঁচও অবশ্য পেয়েছি। তিনি পরিষ্কার জানালেন, 'আইনগত ব্যাখ্যার জন্য আইনজ্ঞের সাহায্য নেওয়া বা প্রকৃত সদস্যের সই কিনা সেটা খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে ঠিকই। তবে ব্যাপার হয়ত অতদূর গড়াবে না। কারণ উদ্দেশ্যের দিক থেকে লক্ষ্য আমাদের সকলের একই। ক্লাবের ব্যর্থতায় আমরা ব্যথিত, বিরোধীরা ক্ষিপ্ত। কাজেই আর ঝগড়া বাড়তে না দিয়ে একটা পারস্পরিক সমঝোতা গড়ে তুলতে সকলেই ইচ্ছুক। এ মাসের মধ্যেই সব জানতে পারবেন, ক'টা দিন ধৈর্য ধরুন।

সময় মতো ঝুঁকি নিলে ভারত দিল্লি টেস্টে জিততে পারত

নয়াদিল্লি থেকে রাও আর:

ভারত সফরে এসেই পাকিস্তান অধিনায়ক আসিফ ইকবাল মন্তব্য করেছিলেন, যে দল চতুর্থ ইনিংসে চারশোর বেশি রান করতে পারে তাদের ছোট করে দেখা মোটেই ঠিক কাজ হবে না। সম্ভবত আসিফ ওভালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে ভারতের ব্যাটিং-এর কথা মনে রেখেই এই উচ্চ ধারণা প্রকাশ করেছিলেন।

অথচ ভারতীয় ব্যাটিং শক্তি সম্পর্কে ভারতেরই টেস্ট অধিনায়ক সুনীল গাভাসকরের ধারণা কি? বোম্বাই-র একটি সাপ্তাহিকে (যদি ওই সাপ্তাহিকের প্রতিবেদক সত্যিকথা লিখে থাকেন) সানি বলেছেন, এই সফরে পাকিস্তান ভারতকে দুমড়ে দেবে।

কী অবিশ্বাস্য রকমের পার্থক্য দুই অধিনায়কের মনের গড়নের এবং দৃষ্টিভঙ্গিরও!

সে যাই হোক দিল্লির ফিরোজ শা কোটলায় ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা দুমড়ে যাননি। চরম উত্তেজনায় ভরপুর এবারের দ্বিতীয় পাক-ভারত টেস্ট এক স্মৃতি হয়ে থাকবে। অবশ্য ক্রিকেট রসিকদের মধ্যে এই টেস্টের ফলাফল কি হওয়া উচিত ছিল তা নিয়ে বিতণ্ডা অনেকদিন চলবে। পরবর্তী টেস্টগুলির ফলাফলের পরও এই টেস্ট সম্পর্কে অফুরন্ত আলোচনা চলবে। তবে পাঁচটি দিন প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে যে নাটকীয় সংঘাত ও পট পরিবর্তন এখানকার দর্শকরা দেখেছেন সেই মুহূর্তগুলি দর্শকজীবনের অবসরগুলিতে পাথেয় হয়ে থাকবেই।

বিতর্ক চলতে থাকবে, ঠিক কোন মুহূর্তে ভারত ঐতিহাসিক জয়ের বোড়েটি হাতছাড়া করেছে! প্রায় ২ দিন সময়ের মধ্যে ৩৯০ রান পাওয়া গেল না কেন? যে যাই উত্তর দিন না কেন ড্রয়ের সপক্ষে বা বিপক্ষে, দু'দিকেই যুক্তি আছে। চতুর্থদিনে ভারতের ব্যাটিং মেঘে ঢাকা সূর্য। পঞ্চমদিনে সে যেন আরও বেশি লাজুক—এই সময় বেঙ্গসরকর ও বিশ্বনাথ প্রথম ৬০ মিনিটে জুড়লেন মাত্র ২৭ রান। অথবা পাঠক পরবর্তী ঘটনাগুলিও উল্লেখ করতে পারেন, যখন ইকবাল কাসিমের 'নেগেটিভ' বলগুলিকে তাড়া না করে বেঙ্গসরকার আনমনে ছেড়ে দিলেন। আরও শেষের দিকে অর্থাৎ বাধ্যতামূলক ওভারে কিরমানি একটি 'মেডেন' ওভার খেললেন। আর উইকেটের মধ্যে দ্রুত একটি দুটি রান তোলার প্রচেষ্টা তো ভারতীয়রা ভুলেই গেছেন।

এ সমস্তই অপ্রাসঙ্গিক, যদি তার মধ্যে সত্যি কিছু থেকেও থাকে। তবে প্রথম তিন দিনের ঘটনাবলী কোন ব্যাটসম্যানকেই জয়ের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে না। ১২৬ রানের প্রথম ইনিংস, শুধু তাই নয় ১৪৭ রানে প্রথম দফায় পিছিয়ে পড়া সহজ জয়ের কোন ভিত্তি হতে পারে না। তাই সেই মুহূর্তে উইকেটে টি'কে থাকার পরীক্ষায় পাশ করাটাই হচ্ছে প্রধান। অথচ তা করতে গেলে রান আসবে প্রয়োজনের চেয়ে কম। আর চূড়ান্ত মুহূর্তে ২৬ রানের ফারাক ডিঙোনো যত সহজে মুখে বলা যায়, কাজে পরিণত করা অনেক অনেক কষ্টসাধ্য, সাহসও চাই হিমালয় প্রমাণ।

অবশ্য দিল্লি টেস্টকে কেবলমাত্র তার চূড়ান্ত মীমাংসার দিনেই নাটকীয় মনে হয়নি, এর প্রতিটি দিন একে ক্রিকেটের মহান অনিশ্চয়তার মহিমায় উজ্জ্বল করেছে। প্রথম দফায় ২৭৩ রান—১৯৫৪ সিরিজের পর পাকিস্তান এতো কম রান কখনো করেনি। শুধু তাই নয় এর আগের পাঁচটি টেস্টে পাকিস্তানকে কোন ইনিংসেই ভারতীয় বোলাররা অল-আউট করতে পারেননি। তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে ভারতের বোলাররা তাদের সামর্থ্য সম্পর্কে 'পণ্ডিতদের' উদ্বেগ হেলায় মুছে দিয়ে পাকিস্তানকে আরও কম রানে অল আউট করে দিলেন। এই দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী সময় ভারতের প্রথম ইনিংস পাকিস্তানের 'দ্বিতীয় সর্বনিম্ন' ইনিংস হিসেবে শেষ হলো। ১৯৫১-৫২ সিরিজে লক্ষ্ণৌ টেস্টে ভারত সবথেকে কম রান করেছিল ১০৬ রানে অল আউট হয়ে। এর মধ্যে রয়েছে সিকন্দর বখত ও দিলীপ বেঙ্গসকারের বীরত্ব কাহিনী। কোটলার দর্শকরা ক্রিকেটের প্রায় সব উত্তেজক মনোমুগ্ধকর ঘটনাগুলো এখানে ঘটতে দেখার সৌভাগ্যে মোহিত হলেন।

যাই হোক এভাবে বিচ্ছিন্ন আলোচনা না করে ঘটনাগুলো পরপর সাজানো যাক। আসিফ ইকবাল যখন টসে জিতলেন, তখন একথা না ভাবার কোন কারণই ছিল না যে কোটলায় আবার বিরাট রান সংখ্যা গড়ে তোলার কসরৎ দেখতে চলেছি। নতুন পিচ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে প্রচুর রান দিয়েছে এবং একটু বেশি 'ফাস্ট' উইকেট।

আশা ছিল, পিচ পাকিস্তানের রান যন্ত্রকে আগের থেকেও বেশি সাহায্য করবে।

কিন্তু দর্শকরা চীৎকার করতেও ভুলে



সুদীপ্ত সিকদার বধ'ত

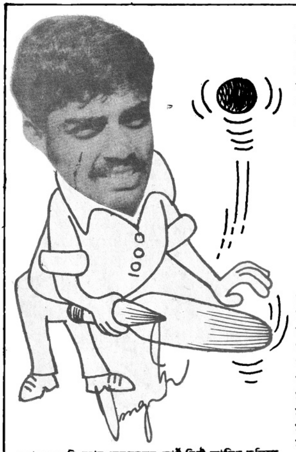
গেলেন যখন পাকিস্তানের প্রথম তিন ব্যাটসম্যান প্রথম দফার মতো দায়িত্ব সেরে, বাকি সময়ে প্লেয়ার্স বক্স-এ বসে খেলা দেখতে চলে গেলেন কপিলদেবের ৯ ওভার বলের মধ্যে। স্কোর বোর্ডে তখন জ্বলজ্বল করছে, পাকিস্তান : প্রথম ইনিংস : ৩ উইকেটে ৩৬। ভীত, সন্ত্রস্ত মজিদ, জাহির ও মুদাস্সর বিদায় নিলেন।

উইকেট নেয়ার ব্যাপারে স্পিনারদের টপকে যাওয়া অবশ্য কপিলদেবের এই-ই প্রথম নয়, কিন্তু এই ইনিংসে ৫৮ রানে পাঁচ উইকেট দখল আগেকার তিনবারের এক ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার থেকে উন্নত গড়। বাকি চারটি উইকেট রজার বিন্নি ও ঘাউড়ি পেলেন, ফলে স্পিনাররা একটি উইকেটও পেলেন না। দুই স্পিনার দিলীপ দোশি ও শিবলাল যাদব যথাক্রমে ১৭ ও ২০ ওভার বল করেছেন যাতে সঠিক লাইন আর লেংথ ছিল খুব কম। ওয়াসিম রাজা ও আসিফ ইকবাল দলের ইনিংস শক্ত ভিতে দাঁড় করানোর লড়াই চালানোর সময় দুই স্পিনারকেই মাঝেমধ্যে যথাযোগ্য শাস্তি দেন। পঞ্চম উইকেটে এই দুই 'গোলিয়াথ' ৯০ থেকে ২২০-তে ইনিংস টেনে নিয়ে যাওয়ার পর বিচ্ছিন্ন হন এবং বাকি ৫৩ রানে সবাই আউট। দ্বিতীয় ইনিংসেও প্রায় একই নাটকের পুনরাভিনয় করলেন পাকিস্তানী ব্যাটসম্যানেরা। পরবর্তী টেস্টগুলির জন্য আসিফ নিশ্চিতভাবেই বেশ চিন্তান্বিত—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভারতের প্রথম ইনিংস, বিষণ্ণ স্মৃতি। ওদের 'স্পীড স্টার' ইমরান মাত্র ৪৫টি নিশানা-হীন বল দিয়ে পিঠের ব্যথার জন্য অবসর নিলেও দেখতে সাধারণ সিকন্দর বখত যেন সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিলেন। দারুণ ধৈর্যে ভর করে তিনি স্টাম্পের নিশানা নির্ভুল রেখে বল করে ব্যাটসম্যানকে খেলতে বাধ্য করলেন। এ ধরনের শবরীর তপস্যা ফিরোজ শা কোটলায় দীর্ঘদিন দেখা যায়নি। ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা মোটেই কোন উন্নত পর্যায়ের ব্যাটিং করছিলেন না। বখত কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনও রাশ আলগা করেননি। তিনি গাভাসকরকে যে বলে আউট করেন তা তার একান্তই নিজস্ব ঢং-এর বল। বলটি সর্ট পিচ হয়ে এত দ্রুত গাভাসকরের ব্যাটের পাশ ছুঁয়ে যায় যে গাভাসকরের মতো পাকা ব্যাটসম্যানও ব্যাট সরাতে পারেননি। অন্যরা তো যেন অফ স্টাম্পের বাইরে মাছ ধরছিলেন। সিকান্দর ভারতের বিরুদ্ধে ফজল মামুদের রেকর্ড (৪২ রানে ৭ উইকেট, লক্ষ্নৌ টেস্ট, ৫১-৫২) অতিক্রম করলেন, অবশ্য বিনু মাঁকড়েরটি (৫২ রানে ৮ উইকেট, দিল্লি টেস্ট, ৫১-৫২) পারলেন না।

তৃতীয় দিনের শেষে পাকিস্তান যখন দ্বিতীয় দফায় ৪ উইকেটে ১৯৭ মোট ৩৩৪ রানে এগিয়ে, তখন ভারতের শিবিরে পরাজয়ের কালো ভুতটা চেপে বসেছে। সবাই তখন গবেষণায় মত্ত। চতুর্থ দিনে আসিফ কখন ইনিংসের দান ছেড়ে বল ধরবেন। ঘটনাক্রমে, সেদিনের শেষেও ক্রিজে রয়েছেন রাজা ও আসিফ।

কিন্তু দ্বিতীয় দিনের সকালের চেয়েও কম ৪১ রানে বাকি ৬টি পাকিস্তানী উইকেট ধসে গেল চতুর্থ দিনের সকালে। আবার কপিলদেব সর্বোচ্চ উইকেট-গ্রহীতা। —৬৩ রানে ৪ উইকেট তার দখলে। অবশ্য দোশি সেদিন উইকেট-গ্রহীতাদের তালিকায় নাম লিখিয়েছে। ৫৬ রানে ২ উইকেট খুব উৎসাহব্যঞ্জক না হলেও দীর্ঘক্ষণ ধরে দোশি



ম্যান অব দি ম্যাচ বেঙ্গসরকর কার্টুনিস্ট আলির তুলিতে

ম্যাণ্ডেটরি ওভার

ভারত-পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্টে যখন বাধ্যতামূলক ২০ ওভারের খেলা শুরু হল, সে সময় ভারতের রান ৪ উইকেটে ২৭৬। জয়ের জন্য প্রয়োজন ৩৯০ অর্থাৎ আরো ১১৪ রান। ওই রান সংগ্রহ একেবারে অসম্ভব কাজ নয়। এ চ্যালেঞ্জ ভারত কিভাবে গ্রহণ করেছিল? ওভার পিছু রান সংগ্রহের তালিকা দেখলে সে সময় দর্শকদের উত্তেজনার আভাস পাওয়া যাবে।

ওভার	বোলার	সংগৃহীত রান	ওভার শেষে ভারতের মোট রান
১	কাসিম	৩	২৭৯/৪
২	বখত্	২	২৮১
৩	কাসিম	৮	২৮৯
৪	বখত্	৯	২৮৯
৫	কাসিম	৫	৩০৩
৬	মুদাস্সর	৫	৩০৮/৫
৭	কাসিম	২	৩১০
৮	মুদাস্সর	৪	৩১৪
৯	কাসিম	৭	৩২১
১০	মুদাস্সর	১	৩২২
১১	আসিফ	১২	৩৩৪
১২	মুদাস্সর	৬	৩৪০
১৩	আসিফ	৪	৩৪৪/৬
১৪	মুদাস্সর	২	৩৪৬
১৫	আসিফ	৫	৩৫১
১৬	মুদাস্সর	৫	৩৫৬
১৭	আসিফ	০	৩৫৬
১৮	মুদাস্সর	৩	৩৫৯
১৯	আসিফ	৫	৩৬৪/৬
২০	উভয় পক্ষের সম্মতিতে এই ওভারের খেলা হয়নি।		

ব্যাটসম্যানদের হাত বেঁধে রেখেছিলেন, সস্তায় উইকেট পাওয়ার চেষ্টা তিনি করেননি।

এরপর ভারতের হাতে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করার সময় রইল পুরো দু'দিন থেকে ৯০ মিনিট কম। শেষ ঘণ্টায় আবার ২০টি বাধ্যতামূলক ওভার। সেই সময়কার ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ভূমিকা যখন এ লেখা পাঠকের কাছে পৌঁছবে তখন ইতিহাসে পরিবর্তিত হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। তবে তারা একথা আবার প্রমাণ করলেন, গত কয়েক বছরে শেষ ইনিংসে বিরাট রানের বোঝার মোকাবিলা করার যে ঐতিহ্য তারা গড়ে তুলেছেন তা নিছকই কাঁচের স্বর্গ নয়। শুধু তাই নয়, গাভাসকর-বিশ্বনাথ সহজে আউট হয়ে গেলেও বাকিরা ওই গৌরব বজায় রাখতে সমর্থ।

চতুর্থ দিনের শেষে ভারতের স্কোর যা ছিল (২ উইকেটে ১১৭) তাতে শেষ দিনে ভারতের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ২৭৩ রান। এই টেস্টে আগের চারটি দিনে কখনোই ওই রান হয়ে ওঠেনি। তবে শেষের দিনের আগের সন্ধ্যায় ভারতীয়রা জয়ের জন্য মোটেই ভাবেননি। ভাবেননি তার প্রমাণ, শেষ দিন সকালে বিশ্বনাথ ও বেঙ্গসরকরের ব্যাটিং। যশপাল ১৯৪ মিনিট উইকেটে থেকে ব্যক্তিগত ৬০ রান করে তবু কিছুটা গতি এনেছিলেন। যশপাল যখন আউট হন তখন ভারতের পরাজয়ের ভয় কেটে গেছে প্রায়। বেঙ্গসরকর রানের পিছনে ছোটার উদ্যোগ নেব নেব করেও নেননি। কারণ কোন নির্ভরযোগ্য সতীর্থ তার আর ছিলনা। ভেঙ্গি ম্যারাথন ৫২৭ মিনিট ব্যাট করেছেন ১৪৬ রান করতে। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের মোট সময় এর থেকে মাত্র ৪৬ মিনিট বেশি। যিনি সব সময় আগ্রাসী ব্যাটে অভ্যস্ত সেই ভেঙ্গির কাছ থেকে এতো বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ সত্যিই অকল্পনীয়। তাই 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' বেঙ্গসরকরের উপযুক্ত পুরস্কার।

সবশেষে আবার বলি, নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে অহেতুক উচ্চধারণা যেমন ঠিক নয়, আবার বাস্তব মূল্যায়ণ করতে না পারাও ঠিক কাজ নয়।

দ্বিতীয় ইনিংসে ইয়াসপাল ব্যাট করছেন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে



স্কোর

পাকিস্তান (প্রথম ইনিংস)

মজিদ ব কপিলদেব	০
মুদাস্সর ক চৌহান বো কপিলদেব	১৮
জাহির বো কপিলদেব	৩
মিঁয়াদাদ এল বি ডব্লু বো ঘাউড়ি	৩৪
ওয়াসিম রাজা এল বি ডব্লু বো কপিলদেব	৯৭
আসিফ ইকবাল ক বেঙ্গসরকর বো ঘাউড়ি	৬৪
ইমরান এল বি ডব্লু বো বিন্নি	৩০
বারি বো কপিলদেব	৯
কাদির বো বিন্নি	৯
কাশিম রান আউট	২
সিকান্দার অপরাজিত	১
অতিরিক্ত	৬
মোট	২৭৩

উইকেট পতন: ১/৩, ২/১৩, ৩/৩৬, ৪/৯০, ৫/২২০, ৬/২২৪, ৭/২৫০, ৮/২৭০, ৯/২৭১।

বোলিং: কপিল ২৪-৪-৫৮-৫, ঘাউড়ি ২১-৪-৫৭-২, বিন্নি ১০-২-৩২-২, দোশি ১৭-৩-৫১-০, যাদব ২০-২-৬৮-০।

ভারত (প্রথম ইনিংস)

গাভাসকর ক বারি বো সিকান্দার	৩১
চৌহান ক বারি বো সিকান্দার	১১
বেঙ্গসরকর ক মিঁয়াদাদ বো সিকান্দার	১
বিশ্বনাথ রান আউট	৪
ইয়াসপাল অপরাজিত	২৮
বিন্নি এল বি ডব্লু বো সিকান্দার	১
কিরমানি বো সিকান্দার	৫
কপিলদেব বো সিকান্দার	১৫
ঘাউড়ি এল বি ডব্লু বো সিকান্দার	০
যাদব ক কাদির বো সিকান্দার	৪
দোশি ক মিঁয়াদাদ বো আসিফ	১০
অতিরিক্ত	১৬
মোট	১২৬

উইকেট পতন: ১/১৯, ২/৩৫, ৩/৪৬, ৪/৫২, ৫/৫৬, ৬/৭০, ৭/৮৭, ৮/৮৭, ৯/৯৪।

বোলিং: ইমরান ৭-৩-৪-১১-০, সিকান্দার ২১-৩-৬৮-৮, আসিফ ৬-২-৪-৩-১, মজিদ ১-০-১২-০, কাসিম ৩-০-৭-০, মুদাস্সার ৩-০-৮-০।

পাকিস্তান (দ্বিতীয় ইনিংস)

মজিদ ক কিরমানি বো বিন্নি	৪০
মুদাস্সার ক কিরমানি বো কপিলদেব	১২
জাহির ক কিরমানি বো বিন্নি	৫০
মিঁয়াদাদ রান আউট	০
রাজা ক কপিল বো দোশি	৬১
আসিফ ক কিরমানি বো কপিলদেব	৩৮
ইমরান ক চৌহান বো দোশি	২
বারি বো ঘাউড়ি	৫
কাদির ক বেঙ্গসরকার বো কপিলদেব	১১
কাশিম অপরাজিত	৫
সিকান্দার এল বি ডব্লু বো কপিলদেব	৬
অতিরিক্ত	১২
মোট	২৪২

উইকেট পতন: ১/৩৯, ২/৬৮, ৩/৬৮, ৪/১৪৩, ৫/২০১, ৬/২০৯, ৭/২১০, ৮/২৩০, ৯/২৩২।

বোলিং: কপিলদেব ২২.৫-৬-৬৩-৪, ঘাউড়ি ১৭-৪-৫৯-১, বিন্নি ১৭-৩-৫৬-২, দোশি ১৯-৬-৩১-২, যাদব ৫-০-২১-০।

ভারত (দ্বিতীয় ইনিংস)

গাভাসকর ক বারি বো সিকান্দার	২১
চৌহান এল বি ডব্লু বো সিকান্দার	৪০
বেঙ্গসরকার অপরাজিত	১৪৬
বিশ্বনাথ বো কাশিম	৩৪
ইয়াসপাল ক ও বো সিকান্দার	৬০
কপিল এল বি ডব্লু বো নজর	২১
বিন্নি ক কাদির বো আসিফ	১০
কিরমানি অপরাজিত	১১
অতিরিক্ত	২১
মোট (৬ উইঃ)	৩৬৪

উইকেট পতন: ১/৩৭, ২/৯২, ৩/১৫৪, ৪/২৭৬, ৫/৩০৮, ৬/৩৪০।

বোলিং: সিকান্দার ৩৭-৭-১২১-৩, আসিফ ২০-৭-৪৬-১, কাশিম ৩০-৫-৮৭-১, নজর ২৫-৮-৬১-১, কাদির ১১-৩-১৬-০, রাজা ২-১-২-০, মজিদ ৪-২-৮-০।

(খেলা অমীমাংসিত)

ছবি: সন্তোষ ঘোষ

দিল্লি টেস্ট দেখলেন মহম্মদ আলি

দিল্লি থেকে কমলেশ থাপলিয়াল ঃ এবার ফিরোজ শা কোটলা মাঠে ভারত-পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের প্রথম দিনেই সাংবাদিকদের জন্য এক বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল। এবার প্রেস বক্সটি এমন জায়গায় করা হয়েছে, যেটা দর্শকদের ভিড়ের থেকে খানিকটা দূরে এবং সাইট স্ক্রীনের ঠিক ওপরে। ওই মাঠে এর আগে কভার করতে গিয়ে সাংবাদিকদের এতটা স্বাচ্ছন্দ্য ছিল আশাতীত ব্যাপার। মনে হয় কর্তৃপক্ষ এতদিন বাদে সাংবাদিকদের প্রয়োজনের কথাটা যথাযথভাবে বিবেচনা করলেন, কিন্তু পুরো প্রশংসা তাদের ভাগ্যে নেই, বারানসীর এক বহুল প্রচারিত হিন্দি দৈনিকের সাংবাদিককে প্রেসবক্সে ঢোকার প্রয়োজনীয় অনুমতি না দিয়ে তারা তাবৎ সাংবাদিকদের বিরাগভাজন হয়েছেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার ওই একই সাংবাদিক দু'মাস আগে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেস্ট ম্যাচে প্রেসবক্সে ঢোকার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন। তবে এবারে নয় কেন? আর একটা অভিযোগ, নতুন প্রেসবক্সে অনেক উন্নতি ঘটলেও, দরকার মত হাঁটা চলার জায়গার বড় অভাব।

প্রথম দিনে প্যাভিলিয়নে ব্লকের কিছু দর্শক দিল্লি ও ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধে



রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডির সঙ্গে দিলীপ দোশির পরিচয়



দিল্লিতে ভারত-পাকিস্তান টেস্ট দেখতে এসেছিলেন বেগম আব্বাস—জাহিরের স্ত্রী

স্লোগান দিয়েছেন। ভি আই পি বক্সটা লোহার রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়ায় ওই দর্শকদের খেলা দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল, তাই এই বিক্ষোভ। পরদিন রেলিং তুলে নেওয়ায় দর্শকেরা আবার খুশী। মাঠের মধ্যে তারাই সবচেয়ে বেশী দামের টিকিট কেটে এসেছিল।

প্রথম দিনের শুরুতেই কর্মকর্তা এবং ভারত ও পাক দলের খেলোয়াড়রা হঠাৎ কেন মৌনতা অবলম্বন করে দু' মিনিট দাঁড়ালেন দর্শকরা তার কারণ জানতে পারেননি। অধিকাংশ দর্শককে সকালে উঠেই মাঠে চলে আসতে হওয়ায় দিনের সংবাদপত্রে অনেকেই চোখ বোলাতে পারেননি। হকি যাদুকর ধ্যানচাঁদ যে পরলোকগমন করেছেন এবং তার উদ্দেশ্যেই যে মৌনতা পালিত হল, সেকথা মাঠে মাইক্রোফোনে জানিয়ে দিলে দর্শকরা হয়তো সে সময় আসনে বসে গল্পগুজবে মত্ত থাকতেন না।

প্রধানমন্ত্রী চরণ সিং প্রথম দিন মাঠে এসেছিলেন কিছুক্ষণের জন্য। কিছুদিন আগেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে খরা-পীড়িত দেশে এত কোটি টাকা খরচা করে এশিয়ান গেমসের আয়োজন করা একটা অর্থহীন বিলাসিতা—এবং সে কারণে কিছু ক্রীড়ামোদীর বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তার ফলস্বরূপ তিনি মাঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের একাংশ স্লোগান দিতে থাকেন 'চরণ সিং গো ব্যাক'।

মাঠে পুলিশী বন্দোবস্ত ভালোই ছিল। মাঠের রেলিং টপকাবার ঘটনা একবারই ঘটেছে। পাঠানের পোশাকে সজ্জিত এক পাকিস্তানী দর্শক উঁচু রেলিং-এর বাধা অগ্রাহ্য করে পাক-বোলিং-হিরো সিকন্দর বখতকে সম্বর্ধনা জানাতে যান। সিকন্দর প্রথমে তাকে এড়িয়ে যেতে চাইলেও সেই নাছোড়বান্দা দর্শক তাকে আহ্লাদে জড়িয়ে ধরেন ও করমর্দন করেন। দর্শকটিকে তাড়া করে আসনে ফিরিয়ে নিয়ে যায় দুই পুলিশ কর্মচারী, তবে সে সময় তাকে দেখে মনে হচ্ছিল বিজয়ী বীর স্বদেশে ফিরছে, মুখে এমনই এক আত্মপ্রসাদের হাসি।

এ টেস্টে সিজন টিকিটের চাহিদা প্রথম থেকেই ছিল। সবচেয়ে বেশী দামের একটা টিকিট জোগাড়ের জন্যও উৎসাহী ক্রিকেট রসিকরা হন্যে হয়ে ঘুরেছেন। ব্যাঙ্কের কাউন্টারে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছিল। তারা কয়েকটি টিকিট বিক্রি করেই 'টিকিট নিঃশেষিত' বোর্ড টাঙিয়ে দেন। তবে ক্রেতাদের জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল। খেলার দিন শেষ পর্যন্ত টিকিট বিক্রি হয়েছে বহুক্ষেত্রে ন্যায্য দামের চেয়েও কমে। আসলে যারা টিকিটের কালোবাজারীর আশায় সেগুলো বিশেষ ক্ষমতা বলে সংগ্রহ করে লুকিয়ে ফেলেছিল, শেষ মুহূর্তে চাহিদা কমে যাওয়ায়, যেটুকু আদায় হয়, এই ভেবে কম দামেও টিকিট বিক্রি করতে বাধ্য হন।

দিল্লি টেস্টে বিশিষ্ট দর্শকদের মধ্যে অন্যতম পাকিস্তান ও ভারতের দুই ফিল্ম স্টার মহম্মদ আলি, দিলীপ কুমার প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গত বছর ভারতের পাকিস্তান সফরের সময় লাহোরে মহম্মদ আলি ভারতীয় দলকে এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন।

ছবি : সন্তোষ ঘোষ

দক্ষিণাঞ্চলের জয়, ম্যাচের শিরোনাম উদয়ভানু

স্টাফ রিপোর্টার : না, পূর্বাঞ্চল ভেঙ্গে পড়েনি দক্ষিণাঞ্চলের বিরাট ৫৩৯ রানের সামনে। আশঙ্কা ছিল, অন্যান্যবারের মত এবারও হয়তো পূর্বাঞ্চলের ইনিংস তাড়াতাড়ি গুটিয়ে যাবে।



টি শ্রীনিবাসন– দক্ষিণাঞ্চলের ৫৩৯ রানের ইনিংসে তার অবদান ১৪৯ / অরুণ মুখার্জি

কিন্তু যায়নি। ৫৩৯ রানের বোঝা মাথায় নিয়েও পূর্বাঞ্চল দমে না গিয়ে যোগ্য জবাব দেবার চেষ্টা করেছে। এবং দিয়েছেও। করেছে ৪৩৫ রান—দলীপ ট্রফিতে এটাই পূর্বাঞ্চলের সর্বোচ্চ ইনিংস। আর এই ইনিংসের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন উদয়ভানু ব্যানার্জি—দিকপাল ফুটবলার মোহিনী ব্যানার্জির ছেলে। পূর্বাঞ্চলের সমগ্র ইনিংসটা জুড়েই ছিল শুধু উদয়ভানুর ব্যাটিং। অসামান্য তৎপরতায় নিখুঁত ব্যাটিং করে গেছেন উদয় আগাগোড়া, একবারের জন্যও 'সুযোগ' না দিয়ে। দলের চতুর্থ উইকেট পড়ার পর ব্যাট করতে নেমেছেন উদয় এবং শেষ পর্যন্ত অপরাজিত অবস্থায় প্যাভিলিয়নে ফিরে এসেছেন। রান করেছেন ১৬৫। এবং কাদের বোলিং-আক্রমনের বিপক্ষে ?—ভেঙ্কট, চন্দ্র, নরসিমা রাও। দলীপ ট্রফিতে এটাই তার আবির্ভাব। উদয় আবির্ভাবে সেঞ্চুরিই শুধু পাননি, অম্বর রায়ের গড়া পূর্বাঞ্চলের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ১২৭ রানের রেকর্ডও ডিঙিয়ে গেছেন। ৭৬-৭৭-এ পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে আমেদাবাদে অম্বর ওই রান করেছিলেন।

প্রধানত উদয়ের ১৬৫ রানের জন্যই এই ম্যাচে পূর্বাঞ্চল দলীপ ট্রফির সর্বোচ্চ ইনিংস (৪৩৫) গড়তে পেরেছে। উদয় ব্যাট করেছেন ৪৩৯ মিনিট, খেলেছেন ৪২৬ বল এবং বাউণ্ডারি মেরেছেন ২১টি। অধিনায়ক রাজু মুখার্জি করেছেন ৭০, হরি গিদওয়ানি খেলেছেন ৫২ রানের একটি ইনিংস এবং মাইকেল দালান্ত ৩৮।

কিন্তু এত করেও পূর্বাঞ্চল দক্ষিণাঞ্চলকে প্রথম ইনিংসের রানে পিছিয়ে ফেলতে পারল না। উদয়কে প্রশান্ত ঘোষ (১৯), অলোক ভট্টাচার্য (২৬) এবং পরমজিৎ সিং (০) যদি আর কিছুটা সহায়তা দিতে পারতেন, তাহলে হয়তো পূর্বাঞ্চল একটা দারুণ জয় অর্জন করতে পারত দক্ষিণাঞ্চলের বিপক্ষে।

তবে এই না পারার পিছনে কিছুটা কারণ অবশ্যই দক্ষিণাঞ্চল দলপতি ভেঙ্কটরাঘবনের নিখুঁত বোলিং। পাঁচটি উইকেট পেয়েছেন তিনি। তার বোলিং অ্যাভারেজ রীতিমত চাঞ্চল্যকর : ৭২-৩৩-৭৯-৫। চন্দ্রশেখর ও ভরত কুমার পেয়েছেন দুটি করে উইকেট।

প্রথমে ব্যাট করে দক্ষিণাঞ্চল ৫৫৫ মিনিটে ৭ উইকেটে ৫৩৯ রান তুলে যখন ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয়, তখন মনে হয়েছিল অতি সহজেই এই ম্যাচে ওরা সরাসরি জয় পাবে। যে কাজটা উত্তরাঞ্চল দল গতবার করেছিল। কিন্তু উদয় তা হতে দেননি। পঞ্চম উইকেটে রাজুর সঙ্গে উদয় যোগ করেছেন ১৭৯ রান এবং দশম উইকেটে আশিস সিন্হার সঙ্গে ৪৩। কিন্তু তবু শেষ রক্ষা হয়নি। পূর্বাঞ্চল প্রথম ইনিংসের ফলে হেরে গেল ঠিকই, কিন্তু রেখে গেল এক প্রাণবন্ত লড়াইয়ের চিহ্ন।

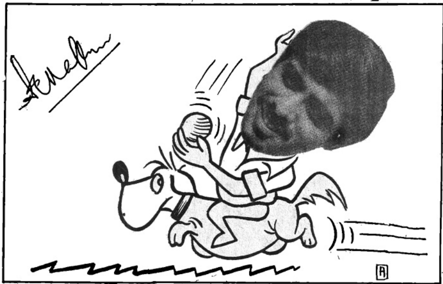
দক্ষিণাঞ্চলের ৫৩৯ করার পথে মুখ্য ভূমিকা ছিল ব্রিজেশ প্যাটেলের ১৮টি চার দ্বারা ২৬১ মিনিটে দ্রুত ও প্রাণবন্ত ১৬৩ এবং টি শ্রীনিবাসনের ২০টি চার দ্বারা ৩৪২ মিনিটে গড়া অনবদ্য ১৪৯ রান। এছাড়া শিবরামকৃষ্ণনের ৭৮, যুগল কিশোরের ৫৪ এবং ভরত রেড্ডির ৪০ অতি সহজেই দক্ষিণাঞ্চলের ইনিংসকে অতদূর পৌঁছে দেয়। পূর্বাঞ্চল বোলারদের তেমন সমীহ না করে বেশ স্বাচ্ছন্দ সহকারেই ওরা ব্যাট করে গেছেন। পরমজিৎ সিং ৫৪ ওভারে ১৪৮ রান দিয়ে তিনটি, অলোক ভট্টাচার্য ৪২ ওভারে ১১৮ রানের বিনিময়ে দুটি, সুব্রত পোড়েল ৩৪ ওভারে ১২৪ রান খরচ করে একটি এবং আশিস সিন্হা ২৬ ওভারে ১১৫ রান ব্যয় করে একটি উইকেট পেয়েছেন।

ডিসেম্বরের ৭ থেকে ১০ খেলা। চারদিনের ম্যাচ। সরাসরি মীমাংসার সম্ভাবনা খুব কম। তাই এক্ষেত্রে যে দল প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকে, জেতে সে দলই। অতএব, দক্ষিণাঞ্চলের চেয়ে ১০৪ রানে পিছিয়ে ইনিংসটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃত পক্ষে এই খেলার ফয়সালা হয়ে যায়। বাকী সময়টুকু নিয়মরক্ষার খেলায় দক্ষিণাঞ্চল দু' উইকেটে ১২২ রান তোলে। সুধাকর ও নরসিমা রাও যথাক্রমে ৪৮ ও ৩৫ রানে নট আউট থাকেন। পোড়েল ও অলোক একটি করে উইকেট পান।



অসাধারণ ১৬৫ রান করার পথে উদয়ভানু একটি চমৎকার ড্রাইভ মারছেন / অরুণ মুখার্জি

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্বাঞ্চল ৪৩৫ রান করতে সময় নিয়েছে দীর্ঘ ৭১২ মিনিট এবং খেলেছে ২১৪'৫ ওভার বল। অবিশ্বাস্যই বটে !



বাহন কুকুর ? আলির কার্টুনে সই করতে গিয়ে ভেঙ্কট হেসেই খুন

স্পিনার থেকে ওপেনার

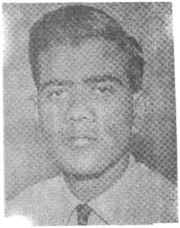
সুব্রত সরকার ঃ শিরোনাম পর্যায়ে নাসিম-উল-ঘানির উপস্থিতিতে কেউ কেউ একটু আশ্চর্য হতে পারেন। কারদার, ফজল, ইমতিয়াজ, হানিফ বা সাঈদের মতন নাসিম কখনও টেস্টে পাকিস্তানের দলনায়ক হননি। ব্যাটসম্যান হিসাবে তার রেকর্ড সামান্য। বোলিং-এ কিছু কৃতিত্ব দেখালেও সেটি অসাধারণ কিছু নয়। তা হলেও, নাসিমের টেস্ট জীবনের মেয়াদ শুরু থেকে শেষ অবধি পুরো ১৫ বছরের ছিল।

নাসিম টেস্ট প্রাঙ্গনে প্রথম খেলতে নামেন ন্যাটা লেগ স্পিনার হিসাবে। সেটি ১৯৫৮-এর জানুয়ারি মাস, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ব্রিজটাউন টেস্টে। তার ২৯তম আর শেষ টেস্ট অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিডনীতে, ১৯৭৩-এর জানুয়ারিতে। এই খেলায় নাসিম একটি ওভারও বল করেননি, অংশগ্রহণ করেছিলেন দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যানরূপে।

ব্রিজটাউনের সেই টেস্টের প্রথম দিনে নাসিমের বয়স মাত্র ১৬ বছর পূর্ণ হয়ে ২৪৮ দিন হয়েছে। সেদিন তিনি হলেন টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে কনিষ্ঠতম খেলোয়াড়। নাসিম-উল-ঘানির জন্ম হয়েছিল নতুন দিল্লিতে, ১৯৪১-এর ১৪ মে। পার্টিশনের সময়েই তার পরিবার পাকিস্তানে চলে যায়।

মাত্র ১৫ বছর বয়সে নাসিম প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে দেশের পয়লা নম্বর ন্যাটা স্পিনার ছিলেন সুজা-উদ-দিন। তবে কারদার সাহেব নাসিমের নৈপুণ্য দেখে বলেন, এই ছেলেটিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী দলে নেওয়া দরকার। ন্যাটা লেগ-ব্রেক বোলার অর্থাৎ অর্থডক্স স্পিনার হিসাবে নাসিম বল ফ্লাইটও তেমন করতেন না, বল অত্যধিক ঘোরাতেনও না। বরং ওই অল্প বয়সে তার নিখুঁত লেনথ ছিল লক্ষ্যণীয়। স্পিনাররা বয়সের সঙ্গে উন্নতি লাভ করে ঃ তবে নাসিমের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটি হয়নি।

টেস্টে নাসিমের প্রথম শিকার হয়েছিলেন গ্যারি সোবার্স—ক্লীন বোল্ড। সব নিয়ে নাসিম ২৯টি টেস্টে মোট ৫২টি উইকেট দখল করেন, গড় ৩৭.৬৭। টেস্টে তার দুটি সব থেকে ভাল পারফর্ম্যান্সই ১৯৫৮-এর সেই সর্বপ্রথম সিরিজে। জর্জটাউনে চতুর্থ টেস্টের



নাসিম-উল-ঘানি

প্রথম ইনিংসে নাসিম ১১৬ রানে পাঁচটি উইকেট পান। তারপর হয় পোর্ট অফ স্পেনে শেষ টেস্ট। পাকিস্তান এই খেলায় ইনিংসে জেতে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে নাসিম ৬৭ রানে ছটি উইকেট নেন।

আগামী সপ্তাহে ঃ মুস্তাক মহম্মদ

আউট করেন কনর‍্যাড হান্ট, গ্যারি সোবার্স, ক্লাইড ওয়ালকট আর কলি স্মিথের মতন ব্যাটসম্যানদের।

নাসিমের টেস্ট জীবনের প্রথম ৮টি খেলা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে। এই ম্যাচগুলিতে তিনি মোট ৩০টি উইকেট নেন—বিদেশে ১৯টি, দেশে ৩টি খেলায় ১১টি। তার বাকি ২১টি টেস্টে নাসিম মাত্র ২২টি উইকেট নিতে সক্ষম হন।

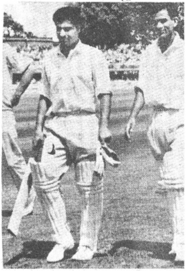
১৯৬০-৬১-এর ভারত সফরে নাসিম প্রথম চারটি টেস্টে পাকিস্তান একাদশে ছিলেন। তবে কৃতিত্ব দেখান খালি কানপুরে দ্বিতীয় টেস্টে। আট নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ন্যাটা নাসিম করেন অপরাজিত ৭০ রান।

ব্যাটিং-এ নাসিম আরও বড় কৃতিত্ব দেখান ১৯৬২-র ইংল্যাণ্ড সফরের সময়ে। লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্ট, প্রথম ইনিংসে পাকিস্তান ১০০ রান করে। ইংল্যাণ্ড ২৭০ রানে এগিয়ে যায় প্রথম ইনিংসে। পাকিস্তানের দ্বিতীয় দফায় মাত্র ৭৭ রানে চারটি উইকেট পড়ে গেছে ঃ ইনিংস পরাজয় অবধারিত। নাসিম প্রথম ইনিংসে ব্যাট করেছিলেন ৮ নম্বর স্থানে। এবার তাকে পাঠানো হল নাইট-ওয়াচম্যান হিসাবে ছ'নম্বর। সেটি দ্বিতীয় দিনের শেষাশেষি।

অপরদিকে ব্যাট করছিলেন অধিনায়ক জাভেদ বার্কি। তৃতীয় দিন নাসিম-বার্কির পঞ্চম উইকেট জুটি স্কোর ২৭৪ অবধি টেনে নিয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডের বোলারদের মধ্যে ছিলেন ফ্রেডি ট্রুম্যান, টোনি লক, ডেভিড অ্যালেন প্রমুখ। নাসিম বিশেষ করে লকের বলে খুব রান করেন। অধিনায়ক পরে শতরানে পৌঁছালেও নাসিম তার অনেক আগে সেঞ্চুরি করে আউট হয়ে যান। নাসিমের ১০১ তার ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে প্রথম শতরান। ইংল্যাণ্ডের মাঠে টেস্ট ম্যাচে ওই প্রথম এক পাকিস্তানী সেঞ্চুরি করলেন। জাভেদ বার্কির সঙ্গে নাসিমের পার্টনারশিপে ১৯৭ রান যোগ হয়। ১৪ বছর সেটি পঞ্চম উইকেটে পাকিস্তানের টেস্ট রেকর্ড ছিল। পাকিস্তান ইনিংস পরাজয় অন্তত তারা আটকালেন।

নাসিমের শেষ সফর ১৯৭২-৭৩ সালে অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যাণ্ড ভ্রমণ করা। তার আগে শেষ খেলেছিলেন ইংল্যাণ্ডে, ১৯৬৭ সালে। সিডনীতে ওপেনার হিসাবে লিলি-ম্যাসি-ওয়াকারের বোলিং-এর বিরুদ্ধে নাসিম-উল-ঘানি করেন মাত্রমুখি ৬৪ রান। নাসিম টেস্টে মোট রান করেন ৭৪৭ (গড় ১৬.৬)।

অনেক বছর ধরেই একসময়ের কনিষ্ঠতম টেস্ট খেলোয়াড় নাসিম-উল-ঘানি ইংল্যাণ্ড থেকে মাইনর কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে স্ট্যাফোর্ডশায়ারের হয়ে খেলেন। অনেকেই বলেন, তেমন চেষ্টা করলে বড় কাউন্টিতে সুযোগ পেতে পারতেন। তবে টেস্টে নাসিমের বোলিং-ব্যাটিং-এর রেকর্ড থেকেও একটা কথা বোঝা যায়। আরেকটু চেষ্টা করলে হয়তো তিনি আরো নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান, আর ভাল বোলার হতে পারতেন।



লর্ডসে জাভেদ বার্কি ও নাসিম-উল-ঘানি (ডাইনে)

"আমার বাবা, নিজের টেনিস শ্যুতে চেরী ব্লস্‌ম্ হোয়াইট ক্লীনার ব্যবহার করেন। আর তাই দেখে আমিও করি.. সত্যিই দারুণ।"

—বলেন
প্রেমজিৎ লালের ছেলে দেব।



স্পোর্ট্‌স শ্যু-তে চেরীব্লস্‌ম্ হোয়াইট ক্লীনার লাগালে তা' দেখতে হয় চোখ ধাঁধাঁনো সাদা...নতুনের মত। এই কারণেই দেবের মতন উদীয়মান টেনিস তারকা এবং তাঁর বাবা ও পৃথিবীর সমস্ত প্রখ্যাত খেলোয়াড়দের চেরী ব্লস্‌ম্ হোয়াইট ক্লীনার চাই-ই চাই।

খেলার মাঠে নিজের ক্রীড়া-নৈপুণ্য গড়ে তুলতে প্রথমেই দরকার-সুপার হোয়াইট স্পোর্টস শ্যু। আজই কিনুন চেরী ব্লস্‌ম্ হোয়াইট ক্লীনার। এখন এ্যাপ্লিকেটরযুক্ত বলে ব্যবহারে খুব সুবিধে।

চেরী ব্লস্‌ম্
হোয়াইট ক্লীনার

চোখ ধাঁধাঁনো সাদা স্পোর্টস শ্যুর জন্য

LINTAS/CBWC/1/2417 BEN



টেবল টেনিসে আরও এগিয়ে যাওয়ার শপথ নিয়েছে দেবযানী

শুক্লা মজুমদার ঃ মনে হয় টেবল টেনিস খেলা আমাদের দেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। তাছাড়া অনেকেরই ধারণা এটা খুবই ব্যয়সুলভ খেলা। কিন্তু ১৯৭৫ সালে কলকাতায় বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা হবার পর অনেক ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এই খেলার প্রতি উৎসাহ জেগেছে। তার জলন্ত প্রমাণ এই কিশোরী দেবযানী বাগচী। বয়স ১৬, উচ্চতা ৫ ফুটের উপর। ছিপছিপে, ফর্সা। মর্ডান হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। লেখাপড়ায় প্রথম তিনের মধ্যে না থাকলেও ভাল ছাত্রী বলতে যা বোঝায়, দেবযানী তাই-ই।

প্রথমে দেবযানী ছিল ছবি আঁকায় পারদর্শী। আঁকার অনেক প্রতিযোগিতায় নেমে পুরস্কার এনেছে। পাঁচ বছর বয়সে আর্ট এরাও প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিল। দুবছর পরে আর একটি প্রতিযোগিতায় গিয়ে সুনাম কুড়ায়।

প্রায় একই সঙ্গে দেবযানীকে কি কারণে জানিনা খেলাধূলায় আকৃষ্ট করল। তাও আবার স্থলের নয়, জলের। বাবার উৎসাহে ভর্তি হল রবীন্দ্র সরোবরে ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটিতে। বছর চারেক না কাটতেই প্রতিযোগিতায় নামতে লাগল। ১৯৭৩-এ বিভিন্ন ক্লাবের সাঁতারে সফল হতেই নির্বাচিত হল রাজ্য প্রতিযোগিতার জন্য। পদ্মপুকুরে বয়সভিত্তিক সাঁতারে দশ বছরের নীচের গ্রুপে ব্রেস্টস্ট্রোকে হল প্রথম। কলেজ স্কোয়ারে আর একটি প্রতিযোগিতায় হল দ্বিতীয়। এরপর বারো বছরের নীচের গ্রুপেও মোটামুটি ভাল ফল করে।

দেবযানী হঠাৎ জল ছেড়ে স্থলে চলে এল ওই ক্লাবেই। শুরু করল ব্যাট আর পিংপং বল নিয়ে খেলা। কিছুদিনের মধ্যেই বিশিষ্ট কোচ সুশীল ব্যানার্জি দেবযানীকে পেলেন, আর তার নরম হাতকে টেবল টেনিসের তাল ও লয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। দেবযানী এই সুযোগ পেয়েছিল মাত্র দু'মাসের জন্য। দেবযানীর যে টেবল টেনিসে কিছু হতে পারে —আর এক টেবল টেনিস বিশেষজ্ঞ অজয় কুমার ঘোষ তা বুঝতে পেরে ওকে নিয়ে যান কাশিমবাজার টুর্নামেণ্টে। সে ১৯৭৪ সালের কথা। বাংলার চ্যাম্পিয়ন চন্দ্রিকা কৌশিকের সঙ্গে দারুণ লড়ে হেরে যায়। হারের প্রধান কারণ ছিল অবশ্য দেবযানীর কম উচ্চতা। এরপর রাজ্য চ্যাম্পিয়ন দিলীপ মুখার্জি দেবযানীর প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন। ১৯৭৪-এ দুর্গাপুরে রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় সে কিছুই করতে পারেনি। কিন্তু পরের বছর কাশিমবাজার ও রাজ্য প্রতিযোগিতায় রানার্স হয়েছিল।

ইতিমধ্যে (১৯৭৫) কলকাতায় বিশ্ব টেবল টেনিস এসে গেছে। বাবা মেঘেন্দ্রবাবু ও মা নমিতা দেবীর হাত ধরে দেবযানীকে প্রতিদিন যেতে দেখেছি নেতাজী স্টেডিয়ামে। লি আইলেসা, পার্ক ইয়ং সুন, চ্যাং লি, ইস্তাভন জনইয়ার, বেঙ্গটসন, সুরবেক, জোহানসন প্রমুখ বিশ্বজোড়া খেলোয়াড়দের সার্ভিস ব্যাক হ্যাণ্ড, ফোর হ্যাণ্ড মার সে এক মনে দেখেছে।

এরই ফলশ্রুতি বোধহয় ১৯৭৬-এ শিলিগুড়ির রাজ্য প্রতিযোগিতায় মৌসুমী চৌধুরীকে হারিয়ে বালিকা বিভাগে তার চ্যাম্পিয়ন হওয়া। পরের বছর ঝাড়গ্রামের রাজ্য প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় অম্বিকা সেনকে ২১-৯, ২১-১৬ ও ২১-১২ পয়েণ্টে হারিয়ে। মহিলা বিভাগে হয়েছিল তৃতীয়। কিন্তু কাশিমবাজারের প্রতিযোগিতায় বালিকা ও মহিলা বিভাগে হল চ্যাম্পিয়ন। গত বছর কলকাতায় রাজ্য প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য টুর্নামেণ্টে দেবযানী মোটামুটি একই ফল বজায় রেখেছিল। কিন্তু এবার যেন দেবযানী টেবল টেনিসে আরও তুখোড়। দেবযানী বালিকা বিভাগের ট্রফি তো জিতলই, মহিলা বিভাগে সেমিফাইনালে তুষারকণা দে-কে হারাল ২৩-২১, ২০-২২, ২১-১৯, ২০-২২ ও ২১-১৬ পয়েণ্টে। ফাইনালে শ্যামলী চৌধুরীকে হারায় ২২-২০, ২১-১৮, ১১-২১, ২১-২৩ ও ২১-১৩ পয়েণ্টে। একটি প্রতিযোগিতার দুটি ইভেণ্টে লড়াই করে রায়গঞ্জের হাজার হাজার দর্শকের হাততালি পেয়েছিল ষোড়শী দেবযানী। ওর বিদ্যালয় মর্ডান হাইস্কুলের ক্লাস টেনের বন্ধুরাও সেদিন কম আনন্দ করেনি।

দেবযানীর জাতীয় প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতাও কম নয়। যাচ্ছে সেই ১৯৭৫ থেকে। এ পর্যন্ত ভারতখ্যাতদের মধ্যে হারিয়েছে আসামের মদালসা হাজারিকা ও মোনালিসা বড়ুয়াকে। তবে সর্বভারতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা ছাড়া কোথাও ভাল ফল করতে পারেনি। উচিতে দক্ষিণাঞ্চল টেবল টেনিসে মহারাষ্ট্রের নিয়তি রায়কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। গতবার কলকাতায় মহিলা ক্রীড়া উৎসবে সিঙ্গলসে ঊষা আয়েঙ্গারকেও হারিয়ে ছিল দেবযানী।

দেবযানীর টেবল টেনিস খেলার এই হল মোটামুটি খতিয়ান।

পড়ার পরেই ওর একটাই লক্ষ্য—তা হল, টেবল টেনিস। খেলার জন্য দরকার সূক্ষ্ম দৃষ্টি, নিখুঁত পদচালনা এবং দম। সবকিছু মিলিয়ে চাই ফিটনেস। দেবযানী আরও বড় হওয়ার জন্য যেমন নানারকম ব্যায়াম করে, তেমনি প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে খেলার প্র্যাকটিসও করেছে চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ-তে। লক্ষ্য একটাই—আরও বড় হওয়া। অনেকের ধারণা দেবযানী ঠিকমত অনুশীলন করলে, যথার্থ ট্রেনিং পেলে, হয়ত আমরা আর একজন শকুন্তলা সেন, রূপা মুখার্জি বা আর একজন ইন্দু পুরীকে দেখতে পাবো। তাই বা কেন, দেবযানী তো ওদেরও ছাড়িয়ে যেতে পারে!●



দেবযানী বাগচী



হলিউডে অভিনেতা চার্লটন হেস্টনের সঙ্গে বিজয়। পিছনে ভাই অশোক

বিজয় উইম্বলডন জয়ের জন্যে রয় এমার্সনকে কোচ নিযুক্ত করেছেন



রায়ান অমলরাজ ঃ টেনিস মানেই টাকার ছড়াছড়ি। র‍্যাকেট ঘোরানো ব্যবসায় বিজয় অমৃতরাজ এখন লক্ষপতি। কিন্তু বিজয় কি টেনিস ইতিহাসে সোনার জলে নিজের নাম লেখানোর বদলে শুধু টাকার পিছনে ছুটে বেড়াবেন? তিনি কি বিয়র্ন বর্গ অথবা জিমি কোনর্স-এর মত উইম্বলডন অথবা ফরেস্ট হিলস জয়ের জন্য আগ্রহী হবেন না? অথচ বাড কলিনস্-এর মত বোদ্ধা ব্যক্তি এক সময় বলেছিলেন, টেনিসে আগামী প্রজন্ম এ বি সি। অর্থাৎ অমৃতরাজ, বি বর্গ এবং সি কোনর্স।

অবশ্য বিজয় নিজে বলেন, তিনি তত টাকার পিছনে ছুটছেন না, যতটা নামের পিছনে। কিন্তু তাহলে কেন তিনি এত বেশি টুর্নামেণ্ট খেলছেন এবং এই একটিমাত্র কারণেই মনে হয় তিনি চূড়ান্ত শিখরে তার খেলার মান নিতে পারছেন না। তিনি বড় টুর্নামেণ্টের জন্য নিজেকে প্রস্তুত না করে অযথা একই স্তরের কিছু টুর্নামেণ্টে খেলে চলেছেন। প্রশ্ন ঃ কেন তিনি আরও বিশ্রাম ও বড় কিছু করার লক্ষ্য নিয়ে শারীরিক ও মানসিক বল অর্জন করে প্রকাশ পাড়ুকোনের মত কিছু করছেন না?

সামান্য হেসে বিজয় বলেন, 'মাস্টার্স টুর্নামেণ্টের জন্য নিবিড় অনুশীলনের মাধ্যমে প্রস্তুতি এবং পরিণতিতে ব্যাডমিণ্টনে বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য প্রকাশ পাড়ুকোন নিশ্চয়ই আমার আন্তরিক অভিনন্দন পাবেন। কিন্তু টেনিস আর ব্যাডমিণ্টন এক নয়। টেনিসে বড় বড় প্রতিযোগিতার মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে সামান্য। টুর্নামেণ্ট খেলা বন্ধ রেখে একটি বড় টুর্নামেণ্টের জন্য প্রস্তুতি নেবার সময় পেতে হলে এটিপি র‍্যাঙ্কিং হারাতে হবে। ফলে সেই বড় টুর্নামেণ্টে খেলার সুযোগ পাওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আমার পক্ষে প্রস্তুতির জন্য অধিক সময় দেবার সুযোগের নিতান্ত অভাব, কিন্তু বর্গ বা কোনর্স-এর মত বড় তারকাদের সে সমস্যা নেই। তারা সময় দিতে পারে।'

বিজয়ের ধারণা, এক্ষেত্রে অনেকদিন এক-নাগাড়ে অনুশীলন খুবই দরকারী নয়, কোনো টেনিস খেলোয়াড়কে এধরনের কাজ করতে উৎসাহ দেওয়াও ঠিক হবে না। তিনি বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনিস তারকা ভিটাস গেরুলাইটিস-এর কথাই ধরুন না। আন্তর্জাতিক টেনিসের জগতে তিনি চার নম্বর। জিদ করেছিলেন ১৯৭৯-র উইম্বলডন জিতবেনই। তাই উইম্বলডন শুরুর আগে আট সপ্তাহ কোন টুর্নামেণ্ট খেললেন না। অনুশীলন করলেন চুটিয়ে। দিনে ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম। উইম্বলডন ঘাসের কোর্টে খেলা হয়, তাই গেরুলাইটিসের সমস্ত খাটাখাটনিই ছিল সেই কোর্টে রপ্ত হবার। ফ্রেড স্টোলে লণ্ডনে তার কোচ ছিলেন। কিন্তু কি

ঘটল ? প্রথম রাউণ্ডেই গেরুলাইটিস ২-৩ সেটে হারলেন স্বদেশী প্যাট ডুপ্রের হাতে। প্রথম দু'টি ডুপ্রে জেতার পর তৃতীয় ও চতুর্থ সেট গেরুলাইটিস লড়াই করে জেতেন, কিন্তু পঞ্চম সেটে ডুপ্রে আবার অপরাজিত। সব থেকে মজার ডুপ্রে উইম্বলডনের আগের পাঁচ সপ্তাহে চারটি টুর্নামেণ্ট খেলে এসেছেন, আর আট সপ্তাহ টুর্নামেণ্ট না খেলার জন্য গেরুলাইটিস কমসে কম দেড় লাখ ডলার হাতছাড়া করেছেন।'

প্রশ্ন করেছিলাম, এর দ্বারা কি প্রমাণ হচ্ছে ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই অথবা তা অর্থহীন ? উত্তর : 'না, নিশ্চিতভাবেই নয়। তবে অনুশীলন, টুর্নামেণ্ট খেলা এবং বিশ্রামের সুষম ভাগাভাগিই কোন খেলোয়াড়কে উইম্বলডন-এর মতো টেনিস সম্মান এনে দিতে পারে।'

'অন্য টুর্নামেণ্ট থেকে দু'সপ্তাহ দূরে থাকাই আমাকে উইম্বলডনের প্রস্তুতি দিতে পারে। উইম্বলডনের জন্য প্রস্তুতি করতে গিয়ে আমি আত্মহত্যা করতে চাই না।' এরপর ১৯৭৯-র উইম্বলডনের জন্য তিনি কিভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, তা' বলতে গিয়ে জানান, 'এ বছর আমি চার সপ্তাহ আগে ইংল্যাণ্ড গেলাম এবং চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য তৈরি হলাম। আমি ভাল খেলেছি একথা জোর দিয়ে বলতে পারি। কিন্তু ভাগ্য আমার প্রতি সদয় ছিল না বলা চলে যখন দ্বিতীয় রাউণ্ডে আমি বিয়র্ণ বর্গের মুখোমুখি হলাম। পাঁচ সেটের লড়াই লড়ে আমি হারলাম বটে, কিন্তু একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই সেদিন যা খেলেছি তাতে বর্গ ছাড়া অন্য যে কেউ আমার কাছে হারতেনই। বর্গই শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।'

আগামী বছরের উইম্বলডনের আগে বিজয় আর একটু বেশি প্রস্তুতি নেবেন মনে করছেন। তবে, বিজয়ের দৃঢ় অভিমত, অতীতের সেই বিরাট সম্মানের উইম্বলডন এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা টুর্নামেণ্ট মাত্র। নগদ অর্থ পুরস্কারের কয়েকটি টুর্নামেণ্টকে বড় টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপগুলির তালিকায় আনতেই হবে। যেমন 'সিকো' টুর্নামেণ্ট—সেখানে চ্যাম্পিয়ন পান ৫০ হাজার ডলার, অথচ উইম্বলডনে ২৫ হাজার। এবারের সিকো টুর্নামেণ্টে বিজয় যোগ দিয়েছিলেন। বিজয় জানিয়েছেন, উইম্বলডনের আগে মার্কিন 'প্রফেশনাল' চ্যাম্পিয়নশিপ (ফিলাডেলফিয়া), মার্কিন ইণ্ডোর চ্যাম্পিয়নশিপ (মেমফিস) ভলভো টেনিস গেম (নিউ হ্যাম্পশায়ার), এলান কিং টেনিস ক্লাসিক, এবং ডব্লিউ সিটি 'মাস্টার্স' টুর্নামেণ্ট সহ আরও কয়েকটি বড় টুর্নামেণ্টে ভাল ফল করতে চান।

ভারতীয় টেনিস গৌরব বিজয় বলে চলেন, 'আমি এই টুর্নামেণ্টগুলির একটিতে অন্তত জয়ী হতে চাই-ই এবং সেজন্য আমার প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার কোন ঘাটতি থাকবে না। খ্যাতি অর্জনের জন্যে সাধারণ স্বার্থ ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত। এজন্যে আমার সাধ্যাতীত অর্থব্যয়েও কুণ্ঠিত নই। দরকার হলে বাড়িতেই একটি সিমেণ্ট কোর্ট তৈরি করে নেব। কোন কোচ এ কার্য সাধনে আমাকে সাহায্য করলে আমি পুরস্কারের অর্থের ভাগ দিতেও রাজি। সেজন্য রয় এমার্সনকে আমি আমার কোচ হিসেবে নিযুক্তও করেছি। আগামী ডিসেম্বরে আমি অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছি সেখানকার 'ওপেন' টুর্নামেণ্টে খেলতে। তখন ওই প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে বড় টুর্নামেণ্টে খেলার টেকনিক ও কৌশল রপ্ত করার ট্রেনিং আমি পাব। পরে জানুয়ারিতে মার্কিন দেশে ট্রেসী অস্টিনের সঙ্গে আমাকে আবার শিক্ষণ দেবেন এমার্সন। এই প্রবীণ চ্যাম্পিয়নের শেখানো ধারা অনুযায়ী আমি আগামী উইম্বলডন পর্যন্ত খেলবো।'

বিজয় জানান, এমার্সন বলেছেন, 'আমার মধ্যে বড় টুর্নামেণ্ট জেতার শক্তি আছে। আশা, আগামী উইম্বলডনে তিনি আমার সঙ্গে থাকবেন এবং আমার আশা পূরণে যথার্থ সহায়তা দেবেন।'

বিজয় এখন আগের চেয়ে দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই আরও বেশি শক্তিধর। 'গত চার, পাঁচ বছর আমি কখনো ভালো, কখনো খারাপ খেলেছি, খেলার ধারা সুসামঞ্জস্য ছিল না। কারণ আমার স্বাস্থ্য। কখনো আমার দেহ আঘাতহীন থাকেনি। এক আঘাতের ব্যথা সামলাতে গিয়ে অন্য অঙ্গ আরও বেশি আহত করে ফেলেছি। ঘাড়, কনুই, পিঠ, পাকস্থলী কোথায় নয়—একটা না একটা সব সময়ই আহত থাকতো। আঘাত পাবার ভয়ে সবসময় ভীত থাকতাম। এখন কিন্তু আমি ভাল আছি। গত পাঁচ বছরে এ বছরই আমি সারা বছরে শরীরের কোন কষ্টে ভুগিনি। ফলে আমার খেলা আরও ভাল হয়েই চলেছে।'

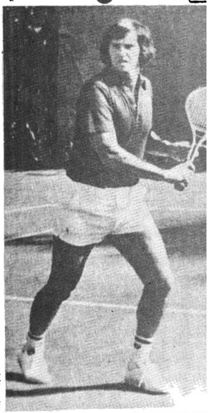
স্বাস্থ্য কেমন করে ভাল হলো জানতে চাইলাম।

বিজয় : আগের চেয়ে বেশি অনুশীলন। এখন আমি প্রত্যেক ম্যাচের আগে একঘণ্টা 'ওয়ার্ম-আপ' করি। ফলে আগের পেশীগুলি আরও সুগঠিত হয়েছে। ম্যাচের আগে 'লোশন ম্যাসাজের ফলেও ভাল ফল পাচ্ছি। তবে যোগাসন আমাকে সব থেকে সুফল দিয়েছে। দিনে ৪০ মিনিট শারীরিক যোগ অভ্যাস করি এবং মননশীল যোগ অভ্যাসও করে থাকি। সত্যি কথা বলতে কি এখনকার মত নিজেকে এত হাল্কা এবং ভয়ানক উৎসাহী আগে জীবনে কোনদিন দেখিনি। আমার ওজন ১৮৫ পাউণ্ড থেকে এখন ১৬৮ পাউণ্ডে এসেছে। ফলে কোর্টে আমার ফল ভাল হচ্ছে।'

বিজয় আর এখন স্টিল র‍্যাকেট ব্যবহার করেন না। উনি এখন বিশেষ ধরনের ফাইবার গ্লাস র‍্যাকেট ব্যবহার করছেন। ফলে প্রথম সার্ভিসটি আরও অনেক বেশি সঠিক হচ্ছে। সার্ভিসের তীব্রতাও বেড়ে যাওয়ায় এখন প্রতিপক্ষ বিজয়ের সার্ভিস ভাঙতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সফল হচ্ছে না।

নীচু ভলি মারা এবং রিটার্নের ক্ষেত্রে বিজয় সবসময়ই দুর্বল। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করাতে জানালেন, আগের থেকে এখন একাজে উনি অনেক বেশি রপ্ত হচ্ছেন।

টেনিস জগতে কাকে এখন আপনার সব থেকে বেশি ভয় ?—উত্তরে বিজয় বলেন : সব খেলোয়াড়ই যার তার হাতে হারতে পারেন। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন ম্যাকেনরোকে আমি সব থেকে বেশি সমীহ করি। তিনি অত্যন্ত আক্রমণাত্মক। সত্যিই আগুনের ফুলকি। কোনর্স-এর মত খেলোয়াড়কেও বেসলাইন থেকে ম্যাকেনরো'র মোকাবিলা করতে হয়। তার নেটে ম্যাকেনরো 'সুপার্ব'।



রয় এমার্সন

দিল্লি ক্রিকেট সংস্থা খেলোয়াড়দের সম্মান দিতে নারাজ কেন?

দিল্লি থেকে পুষ্প শরাফ: ভারতের ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বিষণ সিং বেদী সম্পর্কে দিল্লি অ্যাণ্ড ডিসট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (সংক্ষেপে ডি ডি সি এ) যে ধরনের মনোভাব নিয়েছেন এবং তার ফলে এমন অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, যা আগে কখনো ঘটেনি। এটা অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যদিও ডি ডি সি এ ক্রিকেটকে উপলক্ষ করেই তার যাবতীয় খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জন করেছে, তবু ক্রিকেট বা ক্রিকেটারদের প্রতি তারা ততটা যত্নবান নন। তাদের সংগঠন চলে অনেকটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মত, রাজধানীর ক্রিকেট পরিচালনার ক্ষেত্রে খেলোয়াড়েরা একেবারেই অপাংক্তেয়। এই সংস্থারই অনুমোদিত ক্লাবগুলির কোন ভোটদানের ক্ষমতা নেই। মানে কোন কালেই নেই। যেসব খেলোয়াড় সীমিত গোষ্ঠীর মুরুব্বিয়ানার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তারা অচিরেই ক্রিকেট জগত থেকে বিলীন হয়ে গেছেন। আর ডি ডি সি এ বন্ধুভাবাপন্ন সাংবাদিকদের সহযোগিতায় এতকাল পর্যন্ত সমস্ত সমালোচনার উর্ধ্বে থেকে গেছে। কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে, এমন কি ক্রিকেট লেখকদেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল যখন দিল্লি দলের অধিনায়কত্বের পদ থেকে বেদীকে বঞ্চিত করা হল।


বেদী

একটা উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট হবে দিল্লিতে ক্রিকেটাররা কেমন ব্যবহার পান। এক প্রাক্তন উইকেটরক্ষক, যিনি দীর্ঘদিন দিল্লি দলে খেলেছেন, ডি ডি সি এ-র সদস্যপদের জন্য আবেদন করেছিলেন, এবং সাধারণের অজ্ঞাত কোন এক পরিচালন রীতির ফলে তার আবেদন অগ্রাহ্য হয়। এধরনের অভিজ্ঞতায় সেই ক্রিকেটারটি একটু চালাক হন। তিনি তার ক্রিকেটার পরিচয়টি উহ্য রেখে পেশাগত পরিচয়ের মাধ্যমে সদস্যপদের জন্য আবেদন করেন ও সফল হন; এবং এর পরেই উইলিংডন প্যাভিলিয়নে সদস্যের অধিকারে পায়চারি করতে দেখে ডি ডি সি এ-র বাস্তুঘুঘুরা ভূত দেখার মত চমকে ওঠেন ও তখন আর তাদের কিছুই করার নেই ভেবে মনে মনে অনুতপ্ত হন।

প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটারদের কয়েকজন, এমনকি ভারতের এক প্রাক্তন অধিনায়ক বর্তমানে যিনি পুরোপুরি সাংবাদিকের বৃত্তি গ্রহণ করেছেন ডি ডি সি এ-র দ্বারা অপদস্থ হয়েছেন। এমনকি কর্মরত সাংবাদিকরাও দিল্লি মাঠে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। অবশ্য দিল্লি স্পোর্টস জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হবার পর এবং ফিরোজ শা কোটলা মাঠের প্রেসবক্সের কর্তৃত্ব তারা নিজেদের হাতে নেবার পর থেকে সাংবাদিকদের অসুবিধার অনেক সুরাহা হয়েছে।

দিল্লি এমন একজন ক্রিকেটারের নাম করতে পারবে না, যে কি না পুরোপুরিই ওই স্কুলের তৈরি। মনমোহন সুদ, রাজিন্দার পাল, রমেশ সাকসেনা, অশোক গানদোত্রা, রাজিন্দার গোয়েল, আকাশ লাল বা সুরিন্দর খান্না দিল্লির গর্ব হতে পারতেন, তবে তা সম্ভব হয় নি। ডি ডি সি এ তার নিজস্ব প্রতিভাদের বিকাশের ক্ষেত্রে কখনই আগ্রহী হয় নি। পরিবর্তে অন্য রাজ্য থেকে খেলোয়াড় আনার দিকেই তারা জোড় দিয়েছেন। দিল্লি যে সব ক্রিকেটারদের নিয়ে গর্ব করতে পারে, তারা প্রত্যেকেই অন্য রাজ্যের, যেমন পতৌদির নবাব মনসুর আলি খান, বিষন সিং বেদি, মদন লাল ও অমরনাথ ভাইয়েরা—সুরিন্দর ও মহীন্দর।

দিল্লির ঘরের খেলোয়াড়রা ডি ডি সি এ-র কাছ থেকে যে সৎমায়ের মত ব্যবহার পেয়ে থাকেন, এ সম্পর্কে মনমোহন সুদের অভিজ্ঞতাই সম্ভবত তিক্ততম। এক শুভ প্রভাতে তিনি জানতে পারেন দিল্লি ক্রিকেট দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন।' তার এই নতুন সম্মান লাভের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, দু একটি ক্ষেত্রে ছবি সহ। কিন্তু মনমোহনের আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, কিছু পরেই তিনি জানতে পারেন অধিনায়কের পদ তাকে দেওয়া হচ্ছে না, তার জায়গায় অধিনায়ক হচ্ছেন তরুণ ক্রিকেটার পতৌদির নবাব। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে সুদ ও কয়েকজন সঙ্গী খেলোয়াড় প্রতিবাদ স্বরূপ দলত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এর ফলে ডি ডি সি এ-র চরিত্র সংশোধিত হয়নি, বরং সেই খেলোয়াড়েরাই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন।

এটা ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা, কিন্তু সত্তরের দশকের শেষ ভাগে এসেও তার কোন পরিবর্তন হয়নি। দিল্লিতে ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট চলাকালীন ডি ডি সি এ-র সভাপতি রাম প্রকাশ মেহরা মদন লালকে তার নিজস্ব চেম্বারে ডেকে বলেন—বেদীর বদলে দিল্লি দলের অধিনায়কত্বের ভার তাকে নিতে হবে। মদনলাল ডি ডি সি এ-র কার্যকলাপ সম্বন্ধে পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে সাবধান হয়ে যান ও এই টোপটি গিলতে নারাজ হন। মদনলাল এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন ও বিষয়টি কাগজের লোকদের জানান। যাতে তা জনসাধারণ জানতে পারেন। বিব্রত মেহরা তখন তার সিদ্ধান্ত বদল করার চেষ্টা করেন এবং ব্যর্থ হন।

খেলোয়াড়দের কাছ থেকে এ ধরনের বেগ ডি ডি সি এ এ-র আগে কখনো পায়নি। সম্ভবত এই প্রথম ডি ডি সি এ রঞ্জি ট্রফি দলের অধিনায়কের নাম ঘোষণা না করেই ম্যানেজারের নাম ঘোষণা করে। আর সে সময় প্রসন্ন তার কোম্পানি থেকে বদলির আদেশ পেয়ে দিল্লিতে আসেন, এবং দিল্লি দলে তার সম্ভাবনা ও দলনায়ক নির্বাচনের ব্যাপারে নতুন জল্পনার সূত্রপাত হয়।

এরপর ডি ডি সি এ প্রসন্ন সহ রঞ্জি ট্রফির সম্ভাব্য খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করে কিন্তু তাতে অধিনায়কের পদ কাকে দেওয়া হবে তা জানানো হয়নি। শেষ পর্যন্ত নভেম্বরের ৬ তারিখে কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে অধিনায়কের নাম

ঘোষণা করেন। জম্মু ও কাশ্মীর দলের বিরুদ্ধে ৯ নভেম্বর থেকে যে খেলা হয় তাতে দিল্লির দলপতি ছিলেন বিষণ সিং বেদী। তবে ডি ডি সি এ-র ঘোষণা থেকে এটা এখনো স্পষ্ট নয়, যে রঞ্জি ট্রফির পরবর্তী খেলাগুলোতেও বেদী অধিনায়কত্ব করবেন কি না।

কিন্তু প্রশ্ন হল বেদীর ওপর ডি ডি সি এ-র এই গোঁসার কারণ কি। বাঁ-হাতি এই জগৎবিখ্যাত স্পিনার ও আরো কয়েকজন ক্রিকেটার কয়েক মাস আগে অ্যাসোসিয়েশনকে একটি মেমোরাণ্ডাম দেন। তাতে দাবী ছিল স্থানীয় লিগ আরো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হবে ও খেলোয়াড়দের পাওনা গণ্ডার পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে। এবং আরো দাবী করা হয় রাজধানীর ক্রিকেটার ও তাদের ক্লাবগুলির স্থানীয় ক্রিকেট পরিচালনায় যোগদানের অধিকার দিতে হবে। ডি ডি সি এ-র পক্ষে এতটা মেনে নেওয়া কষ্টকর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই যে অধিনায়ক নির্বাচনের প্রশ্নে এতটা জল ঘোলা হল তাতে সন্দেহ কি?

চলতি সফরে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের আর্থিক লাভ হবে না

সুভাষ দত্ত: পাকিস্তান ক্রিকেট দল তিনমাস ভারত সফর করছে। ৬টি টেস্ট ম্যাচ ও ৭টি তিনদিনের ম্যাচ খেলার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড পাকিস্তান বোর্ডকে 'গ্যারান্টি মানি' হিসেবে দেবে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। অঙ্কটা নেহাত ছোট নয়। কিন্তু অন্যান্য শর্তাদি মেটাতে পাকিস্তান বোর্ডের প্রায় সব টাকাই ব্যয় হবে, হাতে থাকবে মাত্র কয়েকটা টাকা।

কিন্তু ভারতীয় বোর্ড এই সফর থেকে লাভ করবে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষাধিক টাকা। উপরন্তু বিভিন্ন রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনও লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করবে। অবশ্য পাকিস্তানী খেলোয়াড়রা আয় করবেন ভারতীয়দের সমানই। তবে পাক-খেলোয়াড়দের ভবিষ্যতের সংস্থান হবে ভারতীয়দের থেকে সামান্য কিছু বেশী। কারণ পাকিস্তান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এবারের ভারত সফর থেকে ক্রিকেটারদের জন্যে 'প্রভিডেন্ট ফাণ্ড স্কিম' চালু করেছে।

পাক-রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়া-উল-হকের নির্দেশ অনুযায়ী ক্রিকেটাররা এখন প্রতি টেস্টে ফি হিসেবে পাচ্ছেন সাত হাজার টাকা। বোর্ড ঠিক করেছে, এর থেকে ২ হাজার টাকা করে কেটে নিয়ে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অ্যাকাউন্ট খোলা হবে। বোর্ড প্রতি ক্ষেত্রেই আরও ২ হাজার টাকা করে ভরতুকি দেবে। ফলে প্রত্যেক টেস্ট ক্রিকেটারের একটি টেস্ট খেলার পর ভবিষ্যতের জন্য চার হাজার টাকার সংস্থান হবে। এই স্কিমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাক-বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, যেসব ক্রিকেটার মাতৃভূমির বিজয় পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে রাখার জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন, খেলা থেকে অবসর নেওয়ার পর দুর্দিনে তারা যেন ছিন্নমূল হয়ে না পড়েন। এর ফলে যারা ৬টি টেস্ট খেলবে তাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে এই সফরে ২৪ হাজার টাকা জমা পড়বে। তবে স্কিম চালু হওয়ার পর কমপক্ষে ২০টি টেস্ট যারা খেলবেন তারাই প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

ভারতীয়দেরও প্রতি টেস্টে চার হাজার টাকা জমে। এদেশের বোর্ডও সেরকম ব্যবস্থা করেছে। তবে তা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড নয়। ব্যাঙ্কে আমানত হিসেবে কিছু সুদ অবশ্য তাতে পাওয়া যাবে। তবে ব্যাঙ্ক আমানত অপেক্ষা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড উৎকৃষ্টতর—অন্তত ভবিষ্যতের কথা ভাবলে।

যাই হোক, পূর্ব প্রসঙ্গে ফেরা যাক, পাকিস্তান বোর্ড প্রত্যেক টেস্টে ওই সাড়ে আট লাখ টাকা থেকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সহ খেলোয়াড়দের দেবে ১ লক্ষ ৮ হাজার (কারণ দ্বাদশ ব্যক্তিও ফি পাবে)। প্রতি তিনদিনের ম্যাচে ২৪ হাজার করে (প্রতি খেলোয়াড় ২ হাজার করে)। ফলে খেলোয়াড়দের ফি-ই তারা দেবে ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। এছাড়া বোর্ড খেলোয়াড়দের এদেশে আসার আগে সাজ-সরঞ্জাম কিনে দিয়েছে কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকার। এছাড়া পাক বোর্ডই ম্যানেজার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের ফি দেবে। আসা-যাওয়ার প্লেন ভাড়াও পাকিস্তান বোর্ড দেবে। এদেশে আসার পর 'ফাইভ স্টার' হোটেলে থাকা ও লণ্ড্রির মজুরি ভারতীয় বোর্ড দেবে। তবে খাওয়া-দাওয়া, অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের জন্য দিনে প্রতি খেলোয়াড়কে ২০০ টাকা করে এখানকার বোর্ড দেবে।

পাকিস্তানী ক্রিকেটাররা এবারে প্রতিটি টেস্টে পাবেন ৯ হাজার টাকা আবার প্রতি দিনের জন্য ২০০ করে। ভারতীয়রা পাবেন মোট ১০ হাজার ৬ শো টাকা—টেস্ট কেন্দ্রে থাকার সময় যে কদিন তারা সেখানে থাকবেন হোটেলের জন্য ২০০ করে (যদি কম ব্যয় হয় ক্ষতি নেই) তাদের ওই মোট টাকা থেকে দিতে হবে।

গত পাকিস্তান সফরে ভারত গ্যারান্টি মানি পায় ৫ লাখ টাকা। তবে খেলোয়াড়দের আতিথেয়তার ক্ষেত্রে পাকিস্তান ছিল অনেক দরাজ দিল। ভারতীয় খেলোয়াড়রা তখন ফাইভ স্টার হোটেলেই ছিলেন। তবে লণ্ড্রি এবং খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-প্রমোদ বাবদ যত টাকা বিল হয়েছে, সবই পাকিস্তান বোর্ড মিটিয়েছে।

ভারতীয় বোর্ডের সহ সম্পাদক মামা কারমারকরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এবারের সফরে পাকিস্তানী আতিথেয়তার পুনরাবৃত্তি না করে ২০০ টাকা খাওয়া-দাওয়া খরচ বেঁধে দেওয়া হল কেন? মিঃ কারমারকর খোলামনে বলেছিলেন, হোটেলে খাওয়া ইত্যাদি আগে বোর্ড দিত, ফলে দেখা যেত খেলোয়াড়দের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব বোর্ডের পয়সায় বেশ স্ফূর্তি করছে। তাই এই ব্যবস্থা।

এখানে বলা যেতে পারে, পাকিস্তানী খেলোয়াড়রাও কিন্তু এ ব্যাপারে ভারতীয়দের পিছনে পড়ে নেই। ভারতের পাকিস্তান সফরে সে দেশের বোর্ডের সামনেও এটা বিরাট সমস্যা ছিল। তাও তারা কোন নির্দিষ্ট টাকা বেঁধে দেয়নি।

সম্ভবত প্যাকার ক্রিকেট পাকিস্তানী বোর্ডকে অনেক বেশি দিলদরিয়া হতে সাহায্য করেছে। অপরদিকে ভারতীয় ক্রিকেটাররা আন্দোলন করে দাবি আদায় করে নিয়েছেন (যার পরিণতিতে অনেককে বোর্ডের রোষে ভুগতেও হয়েছে)। আর ভারতের সঙ্গে সৎ প্রতিবেশী সম্পর্ক পুনরুজ্জীবনের কাজে ওদেশের বোর্ডের আগ্রহটা যেন এদেশের কর্মকর্তাদের চেয়ে বেশি। তাই কোন লাভের দিকে তারা তাকাননি।



—চিনতে পারছ না! আমাদের ন্যাপা, ওকে সাত দিনের দেখেই তো তুমি টেস্ট খেলতে গিয়েছিলে।

কার্টুন: পিসি

মস্কো '৮০ঃ টিকিটের বাড় বাড়ন্ত, তবু হাহাকার



অতীন সরকার ঃ মস্কোতে অনুষ্ঠিতব্য ২২তম ওলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য দর্শক আসন ২১তম মন্ট্রিয়ল ওলিম্পিকের দেড় গুণের (শতকরা ৬০ ভাগ) বেশী হবে। মস্কোকে কেন্দ্র করে কিয়েভ, মিনস্ক, লেনিনগ্র্যাড ও ট্যালিনে সব মিলিয়ে দর্শকদের জন্য বিক্রি হবে ৫৮ লক্ষ টিকিট। সকাল, বিকেল ও সন্ধ্যায় যতবারই প্রতিযোগিতা হোক না কেন একজন পর্যটক দৈনিক একটি প্রতিযোগিতা দেখতে পাবেন। এবং তাকে পছন্দমতো একটি সেট টিকিট নিতে হবে। ঠিক হয়েছে বিদেশী দর্শকদের জন্য দেওয়া হবে ১৭ লক্ষ টিকিট।

টিকিট বিলি—বণ্টনের জন্য বিভিন্ন সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিদেশী টিকিট বিলি করবে সোভিয়েত পর্যটন সংস্থা—ইনটুরিস্ট। সোভিয়েত ইউনিয়নের টিকিট বিলি করবে—দ্য স্পুটনিক ইন্টার ন্যাশনাল ব্যুরো অন ইউথ ট্যুরিজম এণ্ড দ্য সেণ্ট্রাল কাউন্সিল অব ট্যুরিজম এবং এক্সকার্সন আণ্ডার দ্য অল ইউনিয়ন সেণ্ট্রাল কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়নস্। মস্কো ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দর্শকরা টিকিট পাবেন কাউণ্টার থেকে। এই সব কাউণ্টারে কম্পিউটার মাধ্যমে দৈনিক ৩ লক্ষ টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা থাকবে। এরা অর্থাৎ মস্কো ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দর্শকরা, ২০ ভাগ টিকিট পাবেন। শতকরা ৩৫ ভাগ টিকিট পাবেন সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গ রাজ্যগুলির দর্শকরা। শতকরা ১৫ ভাগ টিকিট সংগঠনী কমিটি নিজের অর্থে সংগ্রহ করবে এবং টেকনিক্যাল লোকদের জন্য সংরক্ষিত রাখবে।

টিকিটের দাম ঠিক হয়েছে—উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য ২৫ রুবল, মণ্ট্রিয়লে ছিল ৪২ ডলার। আর প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সকালের দিকের অনুষ্ঠানের জন্য ২ থেকে ৬ রুবল। সন্ধ্যার অনুষ্ঠান, কোয়ার্টার ফাইনাল, ও সেমিফাইনালের জন্য ৩ থেকে ১৫ রুবল এবং ফাইনালের জন্য ৫ থেকে ১৮ রুবল। তবে সোভিয়েত ক্রীড়ামোদীদের অত বেশী দাম দিতে হবে না। কারণ ট্রেড ইউনিয়ন তহবিল থেকে টিকিটের দামের শতকরা ৬০ ভাগ বহন করা হবে। এছাড়া ওলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গন নির্মাণ ক্ষেত্রের উত্তম কর্মীদের জন্য রাখা হবে ২০০০ ভাউচার। আর শারীর শিক্ষণ কেন্দ্রের শিশু শিক্ষার্থী, ছাত্র ও সার্ভিসের লোকদের জন্য কিছু সংখ্যক বিনামূল্যের প্রবেশপত্র সংরক্ষিত থাকবে।

কোন দেশের কত টিকিট

১৩৩টি দেশের ক্রীড়ামোদীরা টিকিট পাবেন। সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে বিভিন্ন ক্রীড়ার জনপ্রিয়তা, ওলিম্পিক আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ, ওলিম্পিকে ক্রীড়া দলগুলির সংখ্যা বিবেচনা করে টিকিটের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তবে সবদেশই পূর্ববর্তী ওলিম্পিক থেকে বেশী টিকিট পাচ্ছে। 'যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবার পাচ্ছে ২ লক্ষ ১৯ হাজার। মিউনিখ ওলিম্পিকে তারা পেয়েছিল ১ লক্ষ ১৮ হাজার। কানাডা আগে পেয়েছিল ২২ হাজার, এবার পাবে ৫৪ হাজার। তেমনি অস্ট্রেলিয়া ২০ হাজারের জায়গায় ৪২ হাজার পাচ্ছে।

আর বাস্কেট বল, বক্সিং, ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ড, জিমন্যাস্টিক্স, সাঁতার ও ভলিবলের টিকিটের চাহিদা বেশী। তা সত্ত্বেও দেশগুলি নিজেদের আগ্রহ অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ টিকিট বেশী সংখ্যায় পাবে। যেমন আর্জেন্টিনা মহিলাদের ফিল্ড হকি; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাস্কেটবল, বক্সিং, সুইমিং, ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ড ও জিমন্যাস্টিক্স-এর টিকিট বেশী সংখ্যায় পাচ্ছে। ●

ওলিম্পিক-দর্শকদের ধূমপান নিষেধ

খেলোয়াড়দের ধূমপান করা উচিত নয়—একথা সকলেরই জানা। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই নিয়মটি কঠোর—'খেলোয়াড়দের ধূমপান নিষেধ।' এতদিন ওদেশের ইনডোর স্টেডিয়াম বা জিমন্যাসিয়ামে দর্শকদেরও ধূমপান নিষেধ ছিল। মস্কো ওলিম্পিকের সময় সংগঠন কমিটি খোলা মাঠ তথা মুক্ত ক্রীড়াঙ্গণেও দর্শকদের ধূমপান করতে দেবেন না। মস্কো ওলিম্পিকের টিকিটের পিছনে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা থাকবে।

ভি বিচকভ ইতিমধ্যে টিকিটের নমুনা নকশা তৈরি করেছেন। পোস্ট কার্ডের মাপের টিকিটে বিশেষ ধরণের কাগজে ব্যাঙ্ক নোটের জলছাপ থাকবে।

চক্রান্ত করেও যোগরাজকে হয়তো আটকানো যাবে না



বোম্বাই থেকে প্রদীপ্ত বিজয়কর : কপিলদেবকে যেখান থেকে আবিষ্কার করা গিয়েছিল সেই হরিয়ানার খনিতে কি আরও দু/একটি রত্ন পড়ে নেই ? এর উত্তর, হ্যাঁ রয়েছে, যদি তাদের সুযোগ দেওয়া হয়।

যেমন যোগরাজ। দীর্ঘদিন ধরে যদিও সুযোগগুলি তার সামনে মরীচিকা হয়ে চলেছে। কেন ? উত্তর : হরিয়ানা রঞ্জি ট্রফি দল নির্বাচনে জঘন্য রাজনীতিই এর পেছনের কারণ।

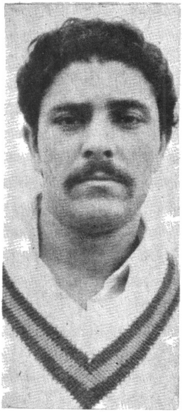
কিন্তু প্রতিভাধর চিরদিন বঞ্চিত থাকে কি ? সাংবাদিক মকরন্দ ওয়েগংকর যোগরাজের যোগ্যতা সম্পর্কে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান পলি উমরিগড়কে বলেন। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে বোর্ড সভাপতি একাদশের চূড়ান্ত দলে যোগরাজ সুযোগ পেলেন। বরোদার সেই ম্যাচে তিনি প্রমাণ করলেন ভারতীয় টেস্ট দলে স্থান করে নেবার যোগ্যতা তার আছে।

৮৭ কিলোগ্রাম দেহধারী যোগরাজের বলের স্টাইল প্রখ্যাত ইংল্যাণ্ড পেসম্যান জন স্নো-র অনুকরণ। তার স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে দৌড়নোর সঙ্গে বলের গতি বাড়াতে দেহের ওজন অবশ্যই কমাতে হবে। তা করতে পারলে ফিল্ডিংও উন্নতি হবে। যদিও বরোদায় তিনি ফিল্ডিং খারাপ করেননি। অন্তত তার চেষ্টা আছে, খাটনিতে তার কোন আলস্য নেই।

অবশ্য যোগরাজের দেহের ওজন বেড়ে যাওয়ার জন্য প্রধান দায়িত্ব হরিয়ানা রঞ্জি দলের অধিনায়ক রবীন্দর ছাড্ডার। ছাড্ডার 'কৃকে' শেষ পর্যন্ত যোগরাজ ক্রিকেট থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। যদিও দৌড়নো প্রভৃতি চালিয়ে যাওয়ার জন্য তার অ্যাথলীট গড়ন ঠিক ঠিক রয়ে গেছে।

হরিয়ানা দলে কপিলের সঙ্গে ছাড্ডার জায়গায় যোগরাজ সুযোগ পাননি অত্যন্ত নগ্ন চক্রান্তের শিকার হয়ে। নানা মিথ্যে অভিযোগও তার নামে করা হয়েছে। লিখিত-ভাবে অস্বীকার করা সত্ত্বেও যোগরাজ দলে স্থান ফিরে পাননি। দু'বছর যোগরাজ ক্রিকেট খেলেননি।

অথচ কয়েক বছর আগে এখানে ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে বোর্ডের হেমু অধিকারীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্ভাবনাময় ক্রিকেটার খুঁজে বের করার জন্য যে জাতীয় শিবির হয় তাতে



যোগরাজের মতো খাটিয়ে এবং আগ্রহী ক্রিকেটার কমই ছিলেন। এর পরই এম সি সি-র বিরুদ্ধে ২৩ বছরের নীচে দলে যোগরাজ সুযোগ পান, কপিলদেব বাদ পড়েন। যোগরাজ একটি উইকেট পান যদিও তার বলের লাইন ও লেংথ নিখুঁত ছিল। সেই উইকেট মোটেই ফাস্ট বোলারদের পক্ষে ছিল না। কারণ এম সি সি-র ফাস্ট বোলাররাও মাত্র ২টি উইকেট পেয়েছিলেন। এরপরই 'ভিজি' ট্রফি জয় করলো উত্তরাঞ্চল যাতে যোগরাজের যথেষ্ট অবদান ছিল। কিন্তু ছাড্ডার কূটকৌশলে তিনি আর এগোতে পারেননি।

হতাশ যোগরাজকে তার বাবা ক্রিকেট ছেড়ে বাড়ির ব্যবসা দেখার উপদেশ দিলেন। যোগরাজ কৃষিকাজ ও পেট্রল পাম্প দেখার কাজে লেগে গেল।

গতবছর তিনি বিয়ে করেছেন। এরপরই একদিন তিনি জলন্ধরে একটি ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ খেলার সময় সাংবাদিক ওয়েগংকরের নজরে পড়ে যান।

দেখা যাক, কপিলদেব ও ঘাউড়ির সঙ্গে একজন 'রিয়েল' ইনসুইংগার টেস্ট দলে ঢুকে ভারতের পেস বলের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সংযোজন করেন কি না। আমার মনে হয়, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাদ্রাজে পঞ্চম অথবা কলকাতায় ৬ষ্ঠ টেস্টে ভারতীয় দলে যোগ-রাজকে সুযোগ দেওয়া উচিত। কেননা তার পরই ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে। তবে মাদ্রাজই যোগরাজের উপযুক্ত পিচ।

যোগরাজের সঙ্গে আরও একজনের প্রতি এখনই দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তিনি হচ্ছেন জলন্ধরের ১৮ বছরের পেস বোলার রাজিন্দর সিং ঘাই। গতবছর তিনি ১৯ বছরের নীচে পাকিস্তান দলের বিরুদ্ধে শেষের দিকে খেলে ভালো ফল দেখিয়েছেন। সম্প্রতি উইলস একাদশের হয়ে বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে ঘাই গাভাসকর ও বেঙ্গসরকারের উইকেট পান। তার একটি বাম্পার গাভাসকরের নাকের ডগা প্রায় ছুঁয়ে গেছে। দিল্লির বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্যাচে তিনি পাঁচটি উইকেট পান। মহীন্দর অমরনাথ ও চেতন চৌহান এই পাঁচটি উইকেটের ২টি।

তবে ফাস্ট বোলার পেতে হলে ফাস্ট উইকেট করা দরকার। আমাদের ক্রিকেট কর্তারা সেদিকে কবে দৃষ্টি দেবেন ? স্পিন নির্ভরতা থেকে পেস নির্ভরতার দিকে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ক্রমবিবর্তন কি আদৌ হবে ?



এন এফ রেল অ্যাথলেটিক্স

সংবাদদাতা : ৩ দিন ব্যাপী এন এফ রেলওয়ে আন্তঃ ডিভিশন অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা মালীগাঁও স্টেডিয়ামে শেষ হল। প্রতিযোগিতায় ৪৫ পয়েন্ট পেয়ে তিনসুকিয়া প্রথম এবং ৩৫ পয়েন্টে আর পি.এফ দ্বিতীয় হয়েছে।

লামডিং এর গোবিন্দ সাহা এবং কাটি-হারের মালা ভট্টাচার্য ব্যক্তিগতভাবে পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

এ বছরের রেকর্ড হয়েছে দুটি। ৮০০ মিটারে করেছেন কাটিহারের সঞ্জয় চ্যাটার্জি (২ মিঃ ৭ সেঃ) এবং হ্যামার থ্রো-তে তিনসুকিয়ার তীর্থকুমার শর্মা (৩৯.৯৪ মিটার)।

এন এফ রেলের জেনারেল ম্যানেজারের পত্নী শ্রীমতী সারদা ভেঙ্কটরমনী প্রতিযোগী-দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন নির্মান বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার টি এম ভারগিজ।



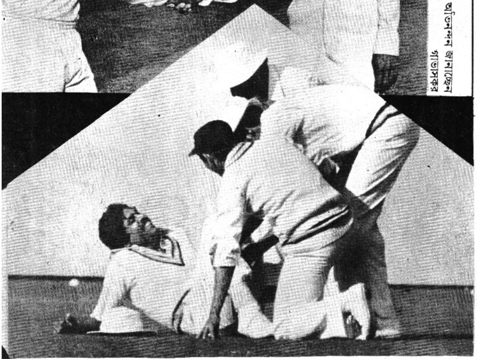
এবারেও টসে জয়ী আসিফ, অভিনন্দন জানাচ্ছেন গাভাসকর



বিনির বলে ওয়াসিম রাজার ছক্কা

ভারত-পাকিস্তান

ছবি ঃ সন্তোষ ঘোষ

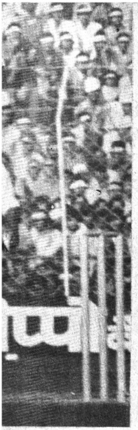


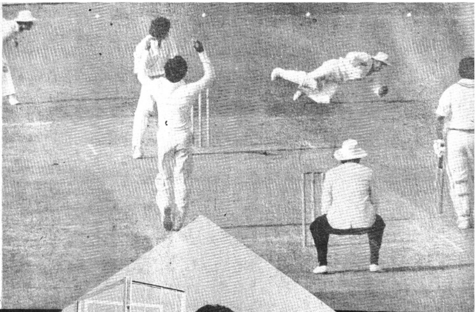
কপিলের বলে জাহিরের বিদায়—সহখেলোয়াড়রা অভিনন্দন জানাচ্ছেন কপিলকে



ইয়াসপালের ব্যাট কি মিঁয়াদাদকে মারতে উদ্যত ?—না ইয়াসপালের তোলা ক্যাচ মিঁয়াদাদ ধরতে না পেরে মাটিতে গড়াগড়ি / কমল







আসিফ ইকবালের বল বিনির ব্যাট ছুঁতেই ওয়াসিম বারি ঝাঁপিয়ে পড়লেন — ক্যাচ ধরতে পারলেন না / কমল

দ্বিতীয় টেস্ট

কমল জুলকা



অটোগ্রাফ শিকারীদের পাল্লায় সিকান্দার বকত



আউট—মিয়াদাদকে স্টাম্পড করছেন কিরমানি (মাটিতে পড়ে) বাঁদিকে গাভাসকর



সিকান্দার বকতের সাফল্যে উল্লসিত একজন স্বদেশবাসী মাঠে ঢুকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন

জাতীয় দাবা— বাংলাদেশে

ঢাকা থেকে আবদুল তৌহিদ ঃ

বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন আয়োজিত প্রথম জাতীয় জুনিয়র দাবা প্রতিযোগিতা সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কাফে-টেরিয়ায় শেষ হয়েছে। জুনিয়র জাতীয় দাবায় প্রথম বারের মত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মনসুর রহমান রাজা। রাজা নয় রাউণ্ড সুইস লিগ প্রতিযোগিতায় অপরাজিত থেকে সাড়ে আট পয়েন্ট সংগ্রহ করে শিরোপা জিতেছেন। জাতীয় দাবাড়ু মারুফ আহমেদ আট পয়েন্ট পেয়ে হয়েছেন রানার্স। প্রথম জাতীয় জুনিয়র দাবায় অংশ নিয়েছিলেন ৭২ জন।

জাতীয় মহিলা দাবা জমেছিল বেশ। জাতীয় মহিলা দাবায় অংশ নিয়েছেন ঢাকা ছাড়া বরিশাল, খুলনা ও রাঙামাটি থেকে মোট ২৬ জন মহিলা। চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন রানী হামিদ কিন্তু এবারের শিরোপা জিততে তাকে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছে। মফস্বলের মেয়েরা তাকে অত সহজে ছেড়ে দেননি। রানার্স হয়েছেন মাহফুজা বেগম।

বাংলাদেশের মহিলা দাবাড়ুদের স্ট্যাণ্ডার্ড একেবারে খারাপ নয়—এ ধারণা এখানকার প্রথিতযশা দাবাড়ুদের।

এবারের এই প্রথম জাতীয় জুনিয়র ও মহিলা দাবার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের দাবা গুরু ও ফেডারেশন সভাপতি ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন। উদ্বোধনী দিনে তিনি সর্বকনিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী ৬ বছর বয়স্ক আনোয়ারুল হক রিপুর সঙ্গে একটি প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। রিপু অবশ্য প্রথম রাউণ্ডে তার চেয়ে ৫/৬ বছরের বড় দাবাড়ুকে হারিয়ে দিয়ে বেশ মাতিয়ে তুলেছিল দর্শকদের।

জাতীয় দাবার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরী। তিনিই বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।



প্রথম জাতীয় মহিলা দাবার চ্যাম্পিয়ন রানী হামিদ

স্পুটনিক ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন

সম্প্রতি স্পুটনিক ইন্টারন্যাশনাল আয়োজিত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ঢাকার জাতীয় ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শেষ হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে প্রায় দেড় শোর মত ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। মেট্রোপলিটন ব্যাডমিন্টন ক্লাবের মরিয়ম ও 'বিগস'-এর হাশেম যথাক্রমে মহিলা একক ও পুরুষ এককে শিরোপা জয় করেন। চূড়ান্ত খেলায় মরিয়ম বাংলাদেশ বিমানের ডানাকে ১২-১১ ও ১১-৬ সেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন।

পুরুষ বিভাগের চূড়ান্ত খেলায় 'বিগস'-এর হাশেম মেট্রোপলিটন ব্যাডমিন্টন ক্লাবের জিলানীকে ১৫-৯, ১৫-৬ সেটে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন। বালকদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মেট্রোপলিটনের বাবলু বিগস-এর বদরকে ১১-১৫, ১৫-৯ ও ১৫-৬ এ হারিয়ে।

বালিকাদের এককে বিজয়ী হয়েছেন 'বিগস'-এ রোকেয়া। রোকেয়া স্পুটনিকের যুথীকে ১১-৭, ৯-১২ ও ১১-০ সেটে পরাজিত করেন।

বালিকাদের ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হয় মেট্রোপলিটনের ঊর্মী ও শাবানা স্পুটনিকের যুথী আর নিম্মাতকে ৬-১৫, ১৫-১২ ও ১৫-১১'এ হারিয়ে দিয়ে।

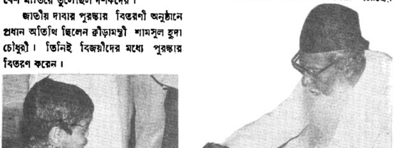
মহিলাদের ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হন 'বিগস'-এর চম্পা আর লুসী। এরা বিমানের ডানা আর মুন্নীকে ১৫-১০ ও ১৮-১৫'তে হারান।

পুরুষদের ডাবলসে জয়ী হন বিমানের বাবলু আর পেনু বিগসের হাশেম আর স্বপন জুটিকে ১৫-৬, ১১-১৫ ও ১৫-১১'তে হারিয়ে দিয়ে।

বালকদের ডাবলসে জয়ী হয় মেট্রোপলিটন-এর বাবলু আর মনোয়ার বিগস-এর বদর আর রানাকে ১৫-৭, ১৫-১২'তে হারিয়ে। মিক্সড ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হয় বিমানের ডানা আর বাবুল জুটি বিমানেরই রশিদা আর পেনু জুটিকে হারিয়ে সরাসরি ১৫-৪, ১৫-৯ সেটে।

জাতীয় স্কুল ফুটবলে জয়দেবপুর রানী বিলাসমণি স্কুল চ্যাম্পিয়ন

সম্প্রতি গাজিপুর মহকুমা সদর জয়দেবপুরের রাজবাড়ি মাঠে জাতীয় স্কুল ফুটবলের চূড়ান্ত খেলা হয়। এবারের এই ৮ম জাতীয় স্কুল ফুটবলের চূড়ান্ত খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা অর্জন করে ঢাকা বিভাগের জয়দেবপুরের রানী বিলাসমণি হাই স্কুল আর রাজশাহী বিভাগের সোনাতোলা মডেল হাই



বাংলাদেশ জাতীয় দাবার উদ্বোধনী দিনে দাবা ফেডারেশন সভাপতি কাজী মোতাহার হোসেন খেলছেন সর্বকনিষ্ঠ (৬ বছর) আনোয়ারুলের সঙ্গে

স্কুল।

ঢাকার ছেলেরা খেলার শুরু থেকেই প্রাধান্য বিস্তার করে খেলতে থাকে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীরা যে তাদের তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল তা ধরা পড়ে খেলার প্রতিটি মুহূর্তে।

বিলাসমণি হাই স্কুল প্রথমার্ধে ৩-১ গোলে এগিয়ে থাকে। আর খেলা শেষে ফলাফল দাঁড়ায় ৬-২। বিলাসমণি স্কুল ৮ম জাতীয় স্কুল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়। বিজয়ী দলের আজমত ও বুলবুল ২টো করে এবং বকুল ও মানজার ১টা করে গোল করে। আর বিজিত দলের পক্ষে দুটো গোলই করে কাদের নেওয়াজ শাহী।

এবারের জাতীয় স্কুল ফুটবলে সেরা ফুটবলার হয় দুজন। চূড়ান্ত খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী দুই স্কুলের সেরা দুই খেলোয়াড়। বিলাসমণি স্কুলের আজমতউল্লা আর সোনাতোলা স্কুলের কাদের নেওয়াজ শাহী।

উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ছেলেদের উৎসাহিত করেন ও পুরস্কার বিতরণ করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও তার মন্ত্রী মইদুল ইসলাম।

ঢাকায় প্রথম বিভাগ ক্রিকেট

১৯৭৯-'৮০ সালের প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের প্রতিযোগিতায় এবারে মোট ২২টা দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এই ২২টা দলকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করে প্রথম পর্যায়ে লিগ শুরু হবে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল সুপার লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। আর এই সুপার লিগের খেলার ভিত্তিতেই লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই চলবে। এ বছরে প্রথম বিভাগ লিগের নীচেকার দুটো দলকে দ্বিতীয় বিভাগে নামিয়ে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।



ব্যাডমিন্টনে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন মরিয়ম স্পুটনিক ব্যাডমিন্টনেও বিজয়ী

প্রতিদ্বন্দ্বী ২২টা দল কোন্ গ্রুপে খেলছে দেওয়া হলো:

'ক' গ্রুপে—মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ন্যাশনাল স্পোর্টিং ক্লাব, ওয়ারি ক্লাব, ইগলেটস সি সি, অগ্রণী ব্যাঙ্ক, ইয়ং পেগাসাস ও টাউন ক্লাব।

'খ' গ্রুপে—আবাহনী ক্রীড়াচক্র, আজাদ বয়েজ, বি পি ডব্লু ডি, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং, বাংলাদেশ জিমখানা, ইলেভেন স্টার বয়েজ ক্লাব ও উদীতি ক্লাব।

'গ' গ্রুপে—ঢাকা ওয়াণ্ডারার্স ক্লাব, বাংলাদেশ বিমান, শান্তিনগর ক্লাব, ধানমণ্ডি ক্লাব, ব্রাদার্স ইউনিয়ন, গ্যাণ্ডেরিয়া ক্রিকেটারস্, অমর জ্যোতি এবং সূর্য তরুণ।

ঢাকা থেকে সব ছবি পাঠিয়েছেন খন্দকার তারেক



daCunha-GCM 16 BN

ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় এশিয়ান আর্চারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত কয়েক বছর তীরন্দাজীর জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাংলার জয়জয়কার। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ সব সময়েই বাংলার দখলে থেকেছে। ১৯৭৪ সালে প্রথম জাতীয় তীরন্দাজীতে পুরুষদের চ্যাম্পিয়ন চন্দ্রকুমার দাস। তারপর ৭৫-এ পিণ্টু সমাদ্দার, ৭৬-এ প্রদীপ কুণ্ডু, ৭৭-এ কোনও জাতীয় প্রতিযোগিতা হয়নি, ৭৮-এ শিশির দাস এবং ৭৯-তে আবার পুরুষদের চ্যাম্পিয়ন চন্দ্রকুমার দাস এবং মহিলা চ্যাম্পিয়ন কৃষ্ণা দাস। এমন কি এ বছর জুন মাসে মঙ্গোলিয়ার উড়ান-বাতোর-এ আমন্ত্রণমূলক তীরন্দাজীতে এবং জুলাই মাসে বার্লিনে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপসে, ভারতের প্রতিনিধি দলের সব ক'জনই ছিলেন বাংলার পুরুষ দলে ছিলেন—চন্দ্রকুমার দাস শিশির দাস এবং ধনপতি ঘোষ আর মহিলা দলে ছিলেন—কৃষ্ণা দাস ভারতী চক্রবর্তী এবং পূর্ণিমা দাস। যদিও যথাসময়ে প্লেনের টিকিট না পাওয়ায় ভারতীয় তীরন্দাজী দল মঙ্গোলিয়া যেতে পারেন এবং বার্লিনের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপসে দক্ষিণ আফ্রিকার যোগদানের প্রতিবাদে আরও ১৫টি দেশের সঙ্গে ভারতও প্রতিযোগিতা বয়কট করে।

সর্বভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে অন্য কোনও বিভাগে বাংলার ছেলেমেয়েরা এরকম নিরঙ্কুশ সাফল্যের নজির গড়তে পারেননি। তবুও পশ্চিমবঙ্গে তীরন্দাজী তেমন প্রসার বা জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। প্রধানত প্রবীন তীরন্দাজ যজ্ঞেশ্বর ঘোষের উৎসাহে ১৯৭৪ সালে এ রাজ্যে বেঙ্গল আর্চার্স অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়। অনুমোদিত চৌদ্দটি সংস্থা বাবদ অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক আয় মাত্র একশ চল্লিশ টাকা। অন্য কোনও আয় এই সংস্থার নেই। কাজেই, ইচ্ছা থাকলেও প্রধানত পয়সার অভাবে অ্যাসোসিয়েশন তীরন্দাজী প্রচার বা প্রসারের কাজে নামতে পারেনি। যদিও সারা ভারতের একমাত্র আধুনিক এবং আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষণপ্রাপ্ত তীরন্দাজী প্রশিক্ষক চন্দ্রকুমার দাস এ রাজ্যেরই অধিবাসী।

হালফিল পশ্চিমী দুনিয়ায় তীরন্দাজী অত্যন্ত জনপ্রিয় স্পোর্টস। ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক প্রত্যেকটি দেশেই তীরন্দাজী নিয়ে মেতে উঠেছে। প্রধানত ওই সমস্ত দেশের উৎসাহে বিগত দুটি অলিম্পিকে (মেক্সিকো এবং মণ্ট্রিল) অন্যান্য খেলাধূলার সঙ্গে তীরন্দাজী প্রতিযোগিতায় স্থান পেয়েছে। গত এশিয়ান গেমসে জাপান পুরুষ বিভাগে এবং দক্ষিণ কোরিয়া মহিলা বিভাগে এশীয় চ্যাম্পিয়ন। বার্লিনের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপসে পুরুষ বিভাগে আমেরিকা এবং মহিলা বিভাগে দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

সামর্থ্য না থাকলেও কর্মক্ষমতা এবং সদিচ্ছার কোনও কমতি এ রাজ্যের আর্চার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেই। তারই প্রমাণ—অ্যাসোসিয়েশন আগামী ৯-১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এশিয়ান আর্চারির আয়োজন করছে। ভারত সমেত চোদ্দটি দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ওই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য। ইতিমধ্যেই থাইল্যাণ্ড, ফিলিপিনস, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া এবং চীন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। এছাড়া জাপান, ইন্দোনেশিয়া এবং মঙ্গোলিয়া অবশ্যই যোগ দেবে বলে উদ্যোক্তারা আশা রাখেন। এশীয় চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ) জাপান এবং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন (মহিলা) দক্ষিণ কোরিয়ার যোগদান ছাড়াও মঙ্গোলিয়া এবং চীনের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতার গুরুত্ব বাড়বে। ভারতের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন চন্দ্রকুমার দাস অবশ্য এই প্রতিযোগিতায় ভারতের সাফল্য সম্বন্ধে খুবই আশাবাদী। ভারতীয় দল গঠনের ট্রায়াল হবে কলকাতায় ২৫-২৬ ডিসেম্বর।

এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে আড়াই লক্ষ টাকা। আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন তাদের সীমিত সামর্থে এধরনের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অপারগ জেনে ক্রীড়া পর্ষদের কমল বসু, আই এফ এ সম্পাদক অশোক ঘোষ এবং সি এ বি সম্পাদক বিশ্বনাথ দত্তের পরিচালন ক্ষমতার উপর ভরসা করে তাদের নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি তৈরি করেছে। প্রয়োজনীয় অর্থের কিছু পরিমাণ অর্থ রাজ্য সরকার এবং কিছু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়ার আশা রাখেন উদ্যোক্তারা।

প্রত্যেকটি প্রতিযোগী রাষ্ট্রের সর্বাধিক দশ-জন প্রতিনিধির থাকা খাওয়া এবং কলকাতায় থাকাকালে যানবাহনের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে অ্যাসোসিয়েশন। বাসস্থান সমস্যা মেটাতে এম এল এ হোস্টেল ব্যবহারের অনুমতি সরকারের কাছে চাওয়া হয়েছে। পরিবহন ব্যবস্থার জন্য সরকারী পরিবহনের সাহায্য চাওয়া হবে। রাজ্য সরকার এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য সব রকমের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক তীরন্দাজীতে চীনের অংশগ্রহণ এই প্রথম। বার্লিনের বিশ্ব তীরন্দাজীর প্রাক্কালে চীন ইণ্টারন্যাশনাল টার্গেট আর্চারি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করেছে। এশিয়ান আর্চারিতে যোগদানের সঙ্গে সদস্যপদ লাভের ব্যাপারে ভারতীয় প্রতিনিধির উল্লেখযোগ্য সাহায্য এবং সমর্থনের উল্লেখ করে চীন কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

ক্রিকেট

প্রবাল দত্ত



ঝি ঝি পোকা রেগেমেগে
বলেছিল ইডেনে,
চাইনাকো উইকেট
সামনে ও পিছনে।
লর্ডস-লীডস – ব্রিসবেন
যেখানেই গিয়েছি
নেই কোন চ্যাঁচামেচি
চুপ চাপ থেকেছি।
জানো বাপু চ্যাঁচানোই
আমাদের ধর্ম
ফিসফাস কথা বলা
নয় সোজা কর্ম।
ছেড়ে দাও, ফিরে যাই
ঝোপঝাড় জঙ্গলে,
উইকেট ব্যাট বল
থাক ঢাকা কম্বলে।

'ধ্যানচাঁদ, ভারতীয় হকি ও কিছু প্রশ্ন'



বেশ কিছুদিন আগে খেলার আসরে 'ভারতের খেলা ধ্যানচাঁদকে খুশী করতে পারেনি, কিন্তু পাকিস্তানের খেলায় দারা খুশী' এই মর্মে একটি ছবি বেরিয়েছিল, এখনও মনে পড়ছে পাকিস্তানের হাস্যোজ্জল দারার পাশে ভারতীয় হকির মহান ব্যক্তিত্ব হকি-যাদুকর ধ্যানচাঁদের বিব্রত ও ম্লান মুখখানি -যে মুখখানিতে ছিল ভারতীয় হকির পদস্খলনের লজ্জা আর ষাট কোটি ভারতবাসীর দুঃখ ও বেদনা। আজ ধ্যানচাঁদ আর নেই। তিনি দেখে গেলেন তার সাধের দেশ, একদা বিশ্ববিজয়ী ভারতের চরম শোচনীয় দুরবস্থা, হকিতে নাবালক সোভিয়েতের কাছেও ভারতকে হারতে। অনেক ক্ষোভ, দুঃখ ও বেদনা নিয়ে ধ্যানচাঁদ চলে গেলেন। জানি না তার অতৃপ্ত আত্মা পরলোকে শান্তি পাবে কিনা তার দেশের কথা ভেবে। পরাজিত হলে আমরা এখন আর আশ্চর্য হই না, হৈ চৈ করি না, কারণ এ ব্যাপারটা এখন স্বাভাবিকে দাঁড়িয়েছে। তবে তদন্ত কমিটি গড়া হয় এবং এতে যে আসল কাজই হয় না সেটা সবারই জানা। বলা হয়, বর্তমানের আধুনিক ইউরোপীয় হকিতে রপ্ত না থাকায় এ অবস্থা। তাহলে পুরানো ধাঁচের হকি খেলে পাকিস্তান কি করে আন্তর্জাতিক আসরে বাজিমাৎ করছে? অনেক আশায় হকি-সম্রাট তাই বলতেন, 'আধুনিক হকির অনুকরণ না করে ফিরিয়ে আনো সেই ভারতের ট্র্যাডিশনাল হকি, যা দিয়ে আমরা ভারতকে হকির এভারেস্ট শৃঙ্গে তুলে দিয়েছিলুম।'

পরাজয়ের লজ্জায়, ক্ষোভে, অনুতাপে দগ্ধ হয়ে শক্ত হাতে ওই সব কাঁটা উপড়ে ফেলে কেন অন্য দেশের মত আমরা এখনও নিজেদের গড়ে তুলিনি? কত দিন আর আমরা এমনি করে পিছিয়ে পড়ে শুধু স্বর্ণপদক পাওয়ার রঙীন খোয়াব দেখবো? ভারতীয় হকির সর্বোচ্চ শক্তির কাছে আমরা আজ এই প্রশ্নগুলিই রাখছি।

অশোক কুমার চন্দ্র,
শ্যামবাজার, হুগলী।

ইস্টবেঙ্গলে যাবেন কি না পি কে ভেবে দেখছেন?

৫-১২ অক্টোবর সংখ্যা 'খেলার আসর'-এ প্রকাশিত স্টাফ রিপোর্টারের 'পি কে কি অবসর নেবেন, না দলবদল করবেন?' লেখাটি পড়লাম। স্টাফ রিপোর্টার প্রায় ঠিক কথাই লিখেছেন।

ভেতরের খবর: ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা প্রচণ্ড চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবছর পি কে-কে পাওয়ার জন্যে। গত বছরের মত এবারেও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের দু'একজন কর্মকর্তা পি কে-র সঙ্গে কথা বলা শুরু করে দিয়েছেন। তাদের প্রথম বক্তব্য পি কে-র বিষয়ে 'চিন্তা করে দেখছি।' দাঁত থাকতে দাঁতের অর্থ কেউ বোঝে না। বোঝেনি একসময় ইস্টবেঙ্গলও। এখন কিছুটা বুঝতে চাইছে না মোহনবাগান। সাম্প্রতিককালে ভারতীয় ফুটবলে কোন কোচ এত সাফল্য পায়নি। ইস্টবেঙ্গলে থাকাকালীন পি কে অসংখ্য রেকর্ড, বিখ্যাত বিখ্যাত ট্রফিগুলি ইস্টবেঙ্গলকে পাইয়ে দিয়েছিলেন। মোহনবাগানের যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইস্টবেঙ্গলের সৌভাগ্যের রথের চাকা হঠাৎ থেমে গেল। যে সৌভাগ্যের রথের চাকা সারথী হয়ে পি কে নিজেই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তা একসময় নিজেই থামিয়ে দিলেন। মোহনবাগানের দুর্দিনে, মোহনবাগান যখন দিশেহারা, অন্ধকার থেকে আলোয় প্রবেশ করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে ছটফট করছে, ঠিক সেই সময়, আঁধার ঘরের প্রদীপ হয়ে পি কে মোহনবাগানে এলেন। মোহনবাগান আবার অসংখ্য রেকর্ড এবং ট্রফি ঘরে তুলল। তাহলে দেখা যাচ্ছে পি কেয় সাফল্যও সেখানে। ব্যক্তিগতভাবে পি কে-কে যেখানে মোহনবাগানে থাকার জন্যে অনুরোধ করে চলেছেন সেই মানুষটি, যাকে কথা দিয়ে প্রত্যেকেই কথা রাখেন, শৈলেন মান্না। তাকেও পি কে উত্তর দিয়েছেন—'চিন্তা করে দেখছি।' মহাষ্টমীর দিন ইস্টবেঙ্গলের এক জাঁদরেল কর্মকর্তা নাকি এক ঘণ্টা সময় নিয়ে পি কে-র সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। কি কি আলোচনা হয়েছে সব অবশ্য জানা যায়নি। তাব পি কে সম্ভবত দলবদল করবেন। ইস্টবেঙ্গল কেন পি কে-কে আনার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন:

১। ক্লাব একাধিক বছর লিগ পায়নি। শিল্ডও তিনবার পায়নি। বেশ কিছু পয়েন্ট নষ্ট করে লিগ রানার্স হতে হচ্ছে ক'বছর।

২। লিগের ফয়সলা মোহন-ইস্ট ম্যাচেই হচ্ছে না দু'বছর। আগেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলের কাছে পয়েন্ট হারাতে হচ্ছে।

৩। অমল দত্তের ভাষায়—ক্লাব 'পিঠ বাঁচানোর জন্যে' এবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বড় বড় ফুটবল-তারকা এনেও কিছু করতে পারল না।

৪। ইস্টবেঙ্গলের যে রেকর্ডগুলি আছে, সেগুলি মোহনবাগানের নেই। যেমন পরপর ছ' বছর লিগ জয় এবং মোহনবাগানকে পাঁচ গোলে হারান (এ বছর শিল্ডে তো সেই সুযোগ এসে গিয়েছিল মোহনবাগানের হাতের কাছে, যা থেকে পাঁচ গোল খাওয়ার যথাযথ উত্তর দিতে পারা যেত)। এই ধরনের রেকর্ডগুলি যদি পি কে-র পরিচালনায় মোহনবাগান ঘরে তোলে?

৫। মোহনবাগানের যে রেকর্ডগুলি আছে, বিশেষ করে এককভাবে ত্রিমুকুট জয়, সেগুলিকে ছোঁয়া একান্তভাবে প্রয়োজন ইস্টবেঙ্গলের।

৬। সাম্প্রতিককালে ফুটবল নিয়ে হৈ চৈ প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। বিশেষ করে ঘরে ঘরে ছোটদের মধ্যে। এটার শুরু কিন্তু পি কে-র ইস্টবেঙ্গলে থাকাকালীন, এর-ফলে অসংখ্য সমর্থক বেড়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের। বর্তমানে সমর্থক বেড়ে গিয়েছে, বেড়ে চলেছে মোহনবাগানের। পি কে-কে নিয়ে উঠে পড়ে লাগার এটাও একটা কারণ। ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা চিরকালই একটু উত্তেজিত, অর্থাৎ সঠিক অর্থে যৌবনের দূত, অর্থাৎ ওদের চিৎকার খেলোয়াড়দের বিশেষভাবে প্রেরণা যোগায় ভাল খেলার। যেটা মোহনবাগান সমর্থকদের কোনকালেই ছিল না। পি কে আসার পর ধীরে ধীরে সেটা তৈরি হচ্ছিল। এটা বন্ধ করার জন্যেও পি কে-র প্রয়োজন এটা একদম অপ্রিয় সত্য কথা।

আমি মনে করি: ১। পি কে ভারতীয় ফুটবলের মহম্মদ আলী। কারণ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে তিনি ভয় পান না। সেই চ্যালেঞ্জ তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ২। আমি মনে করি, সাংবাদিকদের লিগ শুরুর আগেই, খেলোয়াড়দের স্ট্যাণ্ডার্ড দেখে বলা উচিত নয় কোন্ টিম এবছর ফেবারিট, কোন্ টিম এক নম্বর পাওয়ার যোগ্য। সেটা করা উচিত পি কে কোন্ টিমে আছে সেটা দেখে। আমি মনে করি পি কে যে টিমে থাকে সেই টিমই, সেই বছরের জন্যে ফেবারিট। সেটা যদি পুলিশের মত টিম হয়, তাও।

৩। পি কে ইস্টবেঙ্গলে গেলে এবং সেখানে যদি বেশ কয়েকবছর থাকেন তাহলে আবার ইস্টবেঙ্গল পরপর ছয় বছর লিগ জয় করতে পারে এবং মোহনবাগানকে আবার পাঁচ গোল 'উপহার' দিতেও পারে।

৪। পি কে-র ভোকাল টনিক, সিক্সথ সেন্স আন্তর্জাতিকমানের।

এই হলো পি কে, ফুটবলের প্রথম 'অর্জুন'। এতসব গুণের অধিকারী বলেই তাকে নিয়ে আজ এত আলোচনা।

সর্বশেষ খবর: ইস্টবেঙ্গল টেণ্ট নিঃসন্দেহ যে পি কে আসছেই আসছে। মোহনবাগান টেণ্টও তাই। কিন্তু কয়েক দিন আগে শৈলেন মান্নার সভাপতিত্বে এক গোপন মিটিং হয়ে গেছে তার বাড়িতে, যেখানে কোন সাংবাদিক ছিলেন না। প্রসঙ্গ ছিল পি কে, মিটিং-এর সিদ্ধান্তর বিষয় পি কে-কে জানান হয়েছে। তিনি নাকি মত বদলেছেন অর্থাৎ মোহনবাগানেই থাকছেন। গোপন মিটিং সবাই মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন। সাংবাদিকরাও জানতেন না। কিন্তু দেওয়ালেরও কান আছে। হাওয়ায় খবর ভাসে কলকাতা ফুটবলের। পাঁচুদা কি খবরটি জানেন?

অমরেন্দ্রনাথ ধর,
২৩৪ জামাল রোড, পাটনা-১

নতুনদের পরীক্ষা

নতুনদের পরীক্ষা করা হোক এই মর্মে গত ৩০ নভেম্বর সংখ্যায় ফরাক্কা ব্যারেজ মুর্শিদাবাদ থেকে নারায়ণ কুমার দাসের লেখা চিঠি পড়ে তাকে প্রশংসা জানাতে গিয়েও যেন একটু মর্মাহত হলাম। কারণ, চিঠির শেষাংশে তিনি লিখেছেন যে, রজার বিন্নি, সন্দীপ পাতিল ও রাজিন্দর সিং হনসের মতো সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের অন্তত একটা টেস্টেও যেন পরীক্ষা করা হয়। এই লেখা পড়ে শ্রীদাসের উঠতি খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে আগ্রহী মনোভাবের পরিচয় পেলাম এবং সেটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি বোধহয় বাংলার ক্রিকেট সম্বন্ধে কিছুমাত্র আগ্রহী নন। তার কারণ, তিনি যদি আগ্রহী থাকতেন, তাহলে আশাকরি 'অলোক ভট্টাচার্য' এই নামের অল-

পাঠকের কলমে

রাউণ্ডারটির কথা অন্তত চিঠি লেখার সময় মনে পড়তো এবং মনে হয় যে বর্তমানে সুব্রত পোড়েলের যা ফর্ম তাতে তার নামটাও মনের কোণায় উঁকি দিত। উদাহরণস্বরূপ সদ্যসমাপ্ত অস্ট্রেলিয়া দলের বিপক্ষে পূর্বাঞ্চল দলের জয় সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়া দলের ম্যানেজার বব্ মরিম্যানের মন্তব্যের প্রতি নজর দিলেই বুঝতে পারবেন। চিঠির শেষাংশ যদি এইরূপ হত—যেমন রজার বিন্নি, সন্দীপ পাতিল, অলোক ভট্টাচার্য ও রাজিন্দর সিং হনসের মত……। তাহলে তিনি আশাকরি আরও প্রশংসা পেতেন।

বিশু মল্লিক, জয়ন্তীপাড়া জলপাইগুড়ি।

বাংলার ফুটবলই শ্রেষ্ঠ

প্রতিটি দর্শক যখন উৎকণ্ঠায় অভিভূত ঠিক তখনই প্রসূন ব্যানার্জির দর্শনীয় ফ্রি-কিক পাঞ্জাব পুলিশের জালে গিয়ে চুম্বন করল—নির্ধারিত করল যে ডুরাণ্ড কাপ বাংলাতেই যাবে। দিল্লি তথা ভারতের বুকে আর একবার প্রমাণিত হল বাংলার ফুটবল ঘরানাই শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ তার নিজস্বতা—শ্রেষ্ঠ তার স্কিল।

এবারের ডুরাণ্ডে ইস্টবেঙ্গল না আসায় একা মোহনবাগানের ওপর পড়েছিল বাংলার ফুটবলের সম্মান রাখার গুরুদায়িত্ব এবং সেটা তারা যথাযথভাবেই পালন করেছে। অনেকেই জানেন বা শুনেছেন জে সি টি-র সঙ্গে খেলা দেখার পর অনেকেরই মনে হয়েছিল কি হবে? কিন্তু বি এস এফ—মোহনবাগানের খেলা দেখে মনে হয়েছিল যে এগারটা বাংলার নির্ভীক ফুটবল সৈনিক যুদ্ধ করেছেন, তাদের বিজয় কেতন ওড়াবার জন্য। আমরা বাঙালীরা আজ গর্বিত।

এবারের ডুরাণ্ডে বি এস এফ-এর নরিন্দার গুরুং এর খেলা চোখে লাগার মত। জে সি টি-র পরমিন্দার এবং কাশ্মীরার খেলার অনেক উন্নতি হয়েছে।

এখানে কোন ইস্টবেঙ্গল—মোহনবাগান ভেদাভেদ ছিল না। ছিল শুধু আকাঙ্ক্ষা বাংলার সম্মান রক্ষার—বাংলার মুখ উজ্জল দেখার। সে আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন আজ সফল। এখন চলছে জাতীয় ফুটবল। আরো বড় পরীক্ষা।

আশা. করব ইস্টবেঙ্গল-এর ভেতরের গণ্ডগোল মিটে গেছে। কারণ মনের মধ্যে খেদ থাকলে সংহতি গড়ে উঠতে পারে না। কাজেই সমস্ত ভেদাভেদ ঘুচিয়ে, সংঘবদ্ধ হয়ে বিজয়মাল্য ঘরে নিয়ে আসতেই হবে। আমরা চেয়ে থাকব সেই দিনের জন্য।

দীপক কুমার বিশ্বাস, নতুন দিল্লি।

(২)

কিছু দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল মোহনবাগান ডুরাণ্ড কাপ থেকে বঞ্চিত হবে। লিগ ও শিল্ডের জয় তাদের উত্তেজনা হয়ে পড়বে। এবছরের চারটি প্রতিযোগিতা জয় করে ভারতের শ্রেষ্ঠ দলের মান বজায় রাখল। আমাদের গাঁওতা থেকে ক্লাবকে জানাই অভিনন্দন। রোভার্স জয়ের আশা রাখি।

নরেন্দ্রনাথ মাণ্ডি, আদিবাসী সাঁওতা
সুসার গাঁওতা, বর্ধমান।

(৩)

এই বছরের 'ডুরাণ্ড' জয়ী মোহনবাগান ক্লাবকে জানাই লাখো অভিনন্দন। মোহনবাগানের বর্তমান দলটিকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শক্তি আখ্যা দিয়েছিলেন সাংবাদিক মহাশয়রা। তারা বলেছিলেন মোহনবাগানে উপযুক্ত স্ট্রাইকার নেই। সেই কারণে মোহনবাগানকে ভুগতে হতে পারে। কিন্তু তবুও এই বছর লিগে সর্বাধিক গোল দেয় মোহনবাগান এবং একের পর এক ট্রফি ঘরে তুলছে। স্ট্রাইকাররা যদি গোলকাণা হয়, তাহলে লিঙ্কম্যানদের সেই স্থান পূর্ণ করতে হবে, তাদের ওপর কোচের এই ধরনের নির্দেশ ছিল। তারা তাদের সেই দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। গৌতম-প্রসূন জুটি এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। গৌতম সরকার ভারতীয় ফুটবলের ত্রিমুকুটের এক মুকুট আই এফ শিল্ড-এর ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাবকে তার দেওয়া এক গোল হজম করাতে বাধ্য করিয়েছেন। প্রসূন ব্যানার্জি আরেক মুকুট ডুরাণ্ডের ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিশকে এক গোল উপহার দিয়ে ডুরাণ্ড কাপটিকে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছেন। ভারতীয় ফুটবলের বর্তমানের এক নম্বর জুটি (লিঙ্কম্যান) গৌতম-প্রসূনকে জানাই অজস্র অভিনন্দন। সেই সঙ্গে জানাই কোচ পি কে ব্যানার্জিকে এবং অন্য সকল খেলোয়াড়দের।

বাবু ধর, বিরাটী, কলকাতা-৭০০০৫১।

'ভারত-শ্রেষ্ঠের বারবার হার কেন ?'

'কলকাতায় আই এফ এ শিল্ডে ভারত-বর্ষের অন্য রাজ্যের নামী দলগুলো কেন অংশ-গ্রহণ করে না', একথা কলকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কয়েকজন ক্রীড়া সাংবাদিক প্রশ্ন রেখেছিলেন দিল্লিতে নামী কিছু ক্রীড়া সাংবাদিককে। তাদের মনগড়া নানাবিধ উত্তরের মধ্যে একটা ছিল—'তোমাদের কলকাতায় আমরা গেলেই বা কি, আর না গেলেই কি—ফাইনালে তোমাদেরই সেই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল।' ভাবটা যেন কতকটা ওরা আই এফ এ-র করুণা পেয়ে ফাইনালে খেলে। কলকাতার দল-গুলো কিন্তু নির্দ্বিধায় দিল্লি, বোম্বাই-দার্জিলিং যেখানে প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগিতা হয় সেখানে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও নাগজী, স্ট্যাফোর্ড, বরদলুই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। কারণ একটি। ভারতের নামী দলগুলির মধ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। ফেডারেশন কাপ বিজয়ী দলকে যদি 'চ্যাম্পিয়ন অফ ইণ্ডিয়া' বলে ঘোষণা করা হয়, তবে আই এফ এ শিল্ডের মত ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিযোগিতায় তারা পিছপা হয় কেন ? প্রথম ফেডারেশন কাপ বিজয়ী আই টি আই কলকাতায় শিল্ডে খেলতে এসে প্রথমবার যেভাবে গোলের মালা পরে বিদায় নিয়েছিল তার জন্যই কি অন্য দলগুলি আসে না ? জলন্ধরের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের কথাই ধরা যাক। এবছর তারা ফেডারেশন কাপ জয় করা ছাড়াও ডি সি এম (যুগ্মবিজয়ী), ইণ্ডিপেনডেন্স কাপ ও শ্রীনারায়ণ গোল্ড কাপে বিজয়ীর শিরোপা পেয়েছে।

সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ডুরাণ্ড কাপে আবার তাদের সঙ্গে (সেমিফাইনালে) দেখা হল মোহনবাগানের। তারা কিন্তু ২-০ গোলে পরাজিত হোল। তাহলে সেই সমস্ত সাংবাদিকদের কাছে প্রশ্ন, 'আই এফ এ শিল্ড ছাড়াও গোল্ড কাপ ও ডুরাণ্ড কাপ মোহন-বাগান কাদের আনুকূল্যে ঘরে তুলতে পেরেছে ? জানি না, বোম্বাইতে অনুষ্ঠিতব্য রোভার্স কাপে আবার উত্তরের দলগুলোর সঙ্গে কলকাতার দুই প্রধানের মোলাকাৎ হবে কিনা। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের কাছে অনুরোধ, 'ফেডারেশন কাপ বিজয়ী দলকে আই এফ এ শিল্ড, গোল্ড কাপ, ডুরাণ্ড কাপ ও রোভার্স কাপে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হউক। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি যেন ওইসব টুর্নামেন্টে বিজয়ীর উপর নির্ধারিত হয়, নয়ত 'চ্যাম্পিয়ন অব ইণ্ডিয়া' কথাটি প্রহসনেই পর্যবসিত হবে।

রীণা দাশগুপ্তা, মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা ইংলিশ স্কুল, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

বাংলা হকি, ক্রিকেটেও এগিয়ে আসুক

এই বিশাল ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন খেলার মান ভিন্ন ভিন্ন দেশের উপর নির্ভরশীল। যেমন বাংলা ফুটবলে, পাঞ্জাব হকিতে, বোম্বাই ক্রিকেটে ইত্যাদি হিসাবে ধরা হয়। আমরা জানি আজ ভারত বিদেশে ফুটবল খেলতে গেলে বাংলা, গোয়া, পাঞ্জাব, কেরালা ইত্যাদি থেকে বাছাই করে খেলোয়াড় নেওয়া হয়। হকিতেও ঠিক তেমনই পাঞ্জাব, সার্ভিসেস, এয়ারলাইন্স, দিল্লি, কর্ণাটক, বোম্বাই থেকে নেওয়া হয়। ক্রিকেটেও বোম্বাই, কর্ণাটক, দিল্লি, হরিয়ানা থেকে খেলোয়াড় বাছাই করে ভারত ক্রিকেট দল গঠিত করে। অথচ আমাদের বাংলা থেকে কেন হকি বা ক্রিকেট খেলোয়াড় বাছাই করা হয় না। যেহেতু উপযুক্ত খেলোয়াড়ের অভাব। আজ কলকাতায় লিগ পর্যায়ে হকি ও ক্রিকেট খেলা হয়। সেখানে কত বিপুল উত্তেজনায় খেলাগুলো হয়। অথচ মোহন-বাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং, এরিয়ান,স্পোর্টিং ইউনিয়নের মত বড় বড় হকি ও ক্রিকেট টিম থেকেও আজকাল কোন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয় না।

তারপর বাংলা ক্রিকেট দলে এত নামিদামী খেলোয়াড় (সম্বরণ ব্যানার্জি, মাইকেল দালভী, রাজু মুখার্জি, পলাশ নন্দী, আলোক ভট্টাচার্য, বরুন বর্মন, গোপাল বসু, শ্রীমন্ত ব্যানার্জি) থাকা সত্ত্বেও টেস্ট খেলার মত উপযুক্ত নয় বলে লোকে বলে। তাই এই লজ্জা দূর করতে হলে আমাদের অনেক এগিয়ে যেতে হবে। আজ ভারত ক্রিকেট দলে আমাদের বাংলার সফল বোলার দিলীপ দোশিকে নেওয়া হয়েছে বলে আমরা গৌরব করলে চলবে না।

শ্যামল কুমার মিত্র,
নর্থ লখিমপুর, আসাম।

'অর্জুন' ও গুরদেব

গুরদেব সিং 'অর্জুন পুরস্কার' পেলেন এবছর। ফুটবল বীর তিনি! গুরদেব এশিয়ান গেমস-এ ভারতের অধিনায়কত্ব করেছেন। সত্য। এটাও সত্য, ফুটবলে তার প্রধান কৃতিত্ব—পা দিয়ে জোরে বল মারা। তা যেদিকেই যাক। ফুটবলের গতি তো থামিয়ে দিলেন। এটাও তো কৃতিত্ব! পায়ের স্কিল? বল কন্ট্রোল? ট্যাকলিং এবং ড্রিবলিং-এর যাদু? এগুলোর কি দরকার—যেন তেন প্রকারেণ বল পেলেই উড়িয়ে দাও। পারলে অগ্রসরমান খেলোয়াড় সমেত!

অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত চুনী, বলরাম, প্রদীপ ব্যানার্জি হয়তো তার দিকে তাকিয়ে হতবাক!

অরুণকান্তি লাহিড়ী,
১০ পঞ্চাননতলা লেন, কলকাতা-৩৪।

(২)

আমার এই প্রতিবাদ আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

যেহেতু ৭৭-৭৮ সালে কোন ফুটবলারকে 'অর্জুন' পুরস্কার দেওয়া হয় নাই বলে কি এই রকম দায়-সারা কাজ, না সত্যিকারের বিচার



করেই এই পুরস্কার দেওয়া। ৭৮-৭৯ সালে ফুটবলার হিসাবে 'অর্জুন' পুরস্কার যিনি পেয়েছেন তিনি কিভাবে এই পুরস্কারের যোগ্য তা ভাবলেই অবাক লাগে।

অথচ খ্যাতিমান খেলোয়াড়, যিনি একাধিকবার বিদেশে ভারতের হয়ে প্রতি-নিধিত্ব করেছেন, যার আচরণ অতুলনীয় সেই সুধীর কর্মকার কিনা এই পুরস্কার থেকে বঞ্চিত। তাই নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে এই প্রশ্ন—এটা কি যথার্থই যোগ্যতার বিচার।

দেবাশীষ পাল,
শিবপুর, হাওড়া-৩।

সমাজের মঙ্গল কিসে ?

গত ৯ নভেম্বর ১৯৭৯ সংখ্যাতে সোমেন মুখোপাধ্যায়ের লেখা চিঠিটি পড়ে আশ্চর্য হয়েছি। চিঠিতে ক্রমানুসারে বছরের মাস-গুলির সঙ্গে ক্রিকেট, ফুটবল ও ভলিবল ইত্যাদি খেলার মরশুমগুলি সাজানো। সত্যি কথা। কেননা বারমাসে তেরো পার্বণের মত কলকাতায় প্রায় প্রতি মাসেই ক্রীড়া-প্রেমিকরা মেতে থাকেন। কিন্তু তার সঙ্গে বেকারত্বের কি সম্পর্ক ? আজ থেকে ২০-৩০ বৎসর আগেও তো কলকাতার ক্রীড়াপ্রেমিকরা খেলাধুলো, স্পেকুলেশন ইত্যাদি নিয়ে মেতে থাকতেন। তাহলে সোমেনবাবুর কথা অনুযায়ী এই ক্রমান্বয় বেকারত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্পেকুলেশন, গুলতানি বেড়ে চলেছে।

আর বিক্ষুব্ধ মনোবল, বেকারত্বের উপলব্ধি কি সত্যি সত্যি কোন সরকার কিম্বা ক্লাব কর্তৃপক্ষ সময়ের কৃত্রিম অভাব ঘটিয়ে বন্ধ রাখতে পারে ? বেকারত্বের জ্বালা আমার মতে এমন সৎভাবে কৃত্রিম অভাব (সময়ের) ঘটিয়ে রোধা যায় না। আর যদি রোধা যায়ই—তবে তো একদিকে সমাজেরই মঙ্গল।

পুলক সেনগুপ্ত, দমদম ক্যান্ট, কলকাতা।

একটি করুণ আবেদন

'খেলার আসরে' আমাদের মতো বিকলাঙ্গদের খেলাধূলার চর্চাকে স্থান দিয়েছেন দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছি।

ছোটবেলায় আমার বাঁ-পা ট্রেনে কাটা যায়। প্রতিবন্ধীদের দ্বিতীয় জাতীয় ক্রীড়ায় যোগ দিয়েছিলাম। '৭৮/'৭৯-এর রাজ্য ক্রীড়ায় স্টিক রানে প্রথম। ক্র্যাচ রানে দ্বিতীয় এবং সটপাটে তৃতীয় স্থান লাভ করি। কয়েকবার সাইকেল রেসে যোগ দিয়েছিলাম। এই সাইকেল রেসে অন্যান্য ছেলেরা দুই পায়ে সাইকেল চালাত। আমি এক পায়ে সাইকেল রেস দেওয়ার জন্য আমাকে সেন র‍্যালে কোম্পানির ম্যানেজার এস এন রায়চৌধুরী মহাশয় আমাকে একটি সাইকেল উপহার দেন। এখন অ্যাথলেটিক্স ছাড়াও বিভিন্ন রকমের সাইকেল ব্যালেন্স প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি।

সাইকেলের উপর চারদিনের বেশী থাকব এবং প্রত্যেক দিন খেলা দেখাব মাটি না ছুঁয়ে।

আমাদের ক্রীড়ামন্ত্রী, সমাজ কল্যাণমন্ত্রী বা কোন ক্লাব যদি আমার এই সাইকেল খেলা দেখাবার আয়োজন করেন তবে আমি খুবই উপকৃত হই। কারণ পয়সার জন্য দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়া বন্ধ করেছি। '৮১ সালে পশ্চিমবাংলায় প্রতিবন্ধীদের তৃতীয় জাতীয় ক্রীড়া হবে। তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। আর সটপাট প্র্যাকটিসের জন্য তো আর্টি-ফিসিয়াল লেগ দরকার।

আমি আশা করি যে এক পায়ে সাইকেলে সারা ভারত ভ্রমণ করব অল্প দিনে।

ভীমচরণ জানা, শান্তিপুর, পোঃ-মেচেদা।

'সাবাস রমিত-রঞ্জন'

গত ২৩ নভেম্বর, ১৯৭৯ তারিখে প্রকাশিত 'খেলার আসরে'—'বাংলার দুই তরুণ সিঙ্গাপুর থেকে প্রথম রোয়িং-এর পদক আনল' শীর্ষক রচনাটি পড়ে খুব ভাল লাগল। এই দুই বাঙালী জুটি রমিত মুখার্জি ও রঞ্জন ব্যানার্জি বাঘা বাঘা প্রতিযোগীদের হারিয়ে যেভাবে 'ব্রেয়ার চ্যালেঞ্জ শিল্ড' ভারতে আনল তা সত্যিই প্রশংসার। সবশেষে এই দুজনকে জানাই শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা।

অশোক ঘোষ, বালি, হাওড়া

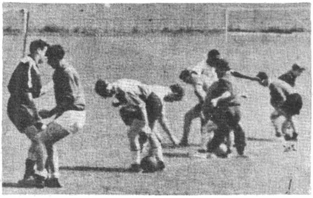
ওরা তিনজন

সাবাস অয়নবাবু, আমি আপনাকে কি বলে অভিনন্দন জানাবো ভেবে পাচ্ছি না। আপনার 'ওরা তিনজন' ক্রিকেট জীবনী পড়ে খুবই আনন্দ পেয়েছি।

মলয় ঘোষ, বর্ধমান।

কি করে ফুটবলার হওয়া যায় (২৪)

স্বরাজ ঘোষ ঃ খেলা চলাকালীন এমন কতকগুলো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে সেগুলোকে মোকাবিলা করতে হলে ডেস্পারেট বা বেপরোয়া হতে হয়। তা না হলে বিপর্যয় অনিবার্য। যেমন শেষ ডিফেণ্ডারকে অতিক্রম করতে পারলেই গোল হওয়া প্রায়



অবধারিত। কাজেই ডিফেণ্ডাররা কখনও তাদের অতিক্রম করতে দেবে না। সময় সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী ডিফেণ্ডাররা ডিফেন্সকে ব্যালান্স বা সংঘবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে আগুয়ান ফরোয়ার্ডদের নিজেদের এলাকায় কিছুটা ঢুকতে দিয়ে নিজেরা কিছুটা পিছিয়ে আসে। তবে পিছিয়ে আসারও শেষ সীমানা আছে। তার বেশী গেলেই বিপদ। কারণ সুটিং রেঞ্জের মধ্যে ফরোয়ার্ডরা এসে যাবে। কাজেই শেষ সীমানা অবধি এসেই দাঁড়িয়ে যেতে হয়। তার পরের পর্বই হল ট্যাকল। ফুটবলের ট্যাকল কথাটি ডাইরেক্ট চার্জ। অর্থাৎ ন্যায়তভাবে প্রত্যক্ষ আঘাত। এই ট্যাকল বিষয়টিতে প্রত্যেক পজিশনের বিশেষত ডিফেণ্ডারকে খুব ভালভাবে দক্ষ হওয়া দরকার। যদিও বিষয়টা একটু কঠিন। এই কাজটি করতে হলে যথেষ্ট তৎপর ও শক্তি সামর্থের দরকার। এই ব্যাপারেও অ্যাথলেটিক্স ফিটনেসের খুব দরকার। যেমন ট্যাকল করতে গিয়ে সব সময়ই সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য হওয়া যায় না। ফলে সে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আউট অব প্লে হয়ে গিয়ে অকেজো হয়ে যায়। কিন্তু অ্যাথলেটিক্স ফিটনেস থাকলে তারসঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে আবার ট্যাকলের জন্য চেজ্ বা তাড়া করে যাওয়ার সামর্থ্য থাকে। সেই অবস্থায় যে ধরনের ট্যাকল করতে হয় অর্থাৎ পিছন থেকে ট্যাকল, তাকে বলা হয় ট্যাকল ফ্রম বিহাইণ্ড।

ট্যাকল দু' রকমের। একটি 'ব্লক ট্যাকল', আরেকটি স্লাইডিং ট্যাকল। ব্লক ট্যাকল্ হল, মুখোমুখি দুই খেলোয়াড় কিকিং পায়ের পাতায় বলের সঙ্গে একযোগে ডাইরেক্ট চার্জ। এই ব্লক ট্যাকলের প্রয়োজন হয় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে। যেমন আগুয়ান খেলোয়াড় ড্রিব্লিং করে শেষ ডিফেণ্ডিং লাইন অতিক্রম



করার জন্য ক্যারি বা ডজ দেওয়ার উদ্দেশ্যে উদ্যত হয়েছে, অথচ ক্যারি বা ডজ করে ডিফেণ্ডাররা ডিফেণ্ডিং লাইন অতিক্রম করতে দেবে না, এই অবস্থায় ডিফেণ্ডারদের ব্লক ট্যাকেল করতেই হবে। হয় ব্লক ট্যাকেল করে ফরোয়ার্ডদের পা থেকে বল ছিনিয়ে নিতে হবে, না হয় বলকে বিপথগামী করে দিয়ে আউট অব প্লে করে দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে স্ন্যাচ্ কথাটি এসে যাচ্ছে যেমন পায়ে বল আসার পরই ট্যাকলের প্রসঙ্গটি আসে, কিন্তু পায়ে বল আসার আগেই ছোঁ মেরে বলটি ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়াকে বলে স্ন্যাচ্ করা। এবার বলছি ব্লক ট্যাকল কি করে করতে হয়।

ব্লক ট্যাকল হল অনেকটা সাপের মত। যখন আগুয়ান খেলোয়াড়ের পায়ে বল থাকে (পায়ে বল না থাকা অবস্থায় নয়) অথবা পায়ে বল রেখে ক্যারি বা ডজ করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বল খেলোয়াড়ের কিকিং পা ও বলের অবস্থান খুব ভাল করে নজর করতে হবে। আর দুই পায়ের টোর উপর ভর করে দৌড়বার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যে ধরনের 'গেট সেট'-এর অবস্থা থাকে, ঠিক সেইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে, মনকে একাগ্র করে, খুব তৎপরের মত মনঃসংযোগ করে পায়ের এ্যাঙ্কেলকে খুব শক্ত করে পায়ের পূর্ণশক্তি দিয়ে নিজের কিকিং পায়ের পাতা দিয়ে আগুয়ান বল খেলোয়াড়ের পায়ের পাতার সঙ্গে বলকে সংযোগ করে সজোরে চার্জ। এই অভ্যাসটি প্রথমে নিশ্চল অবস্থায় অনুশীলন করতে হয়। যেমন, নিশ্চল অবস্থায় এক খেলোয়াড়ের পায়ে বল আছে, তাকে খুব আস্তে দৌড়ের সঙ্গে চার্জ করতে হবে। তারপর কনসেপশন বা ধারণা জন্মে গেলে তখন নিশ্চল অবস্থায় বল খেলোয়াড়টি



সচল হবে ও সচল অবস্থায় ট্যাক্লিং অনুশীলন চলবে। তারপর রেফারির আইন অনুযায়ী এই ট্যাকলের ব্যাপারে একটা বাড়তি সুযোগ দেওয়া আছে সেটা হল, ট্যাক্লিং-এর সঙ্গে ট্যাক্লিং পায়ের দিকের বুক দিয়ে বল খেলোয়াড়কে ড্যাশ করা, তবে একসঙ্গে না হয়ে একটু দেরী হলেই রেফারি ফাউলের নির্দেশ দেবেন। কাজেই পা ও বুক একযোগে চার্জ। এটাকে বলে 'লিগ্যাল চার্জ'। অর্থাৎ বিধিসম্মত চার্জ।

এবার স্লাইড ট্যাকল। খেলোয়াড়ের পা থেকে বলকে বিপথগামী বা আউট অব প্লে করে দেওয়ার জন্য পেছন থেকে অথবা বল খেলোয়াড়ের ডান বা বাঁ-দিক থেকে শরীরকে মাটিতে ফেলে দিয়ে অথবা হেলান শরীর নিয়ে গতির উপর ট্যাকলিং পা-কে বাড়িয়ে দিয়ে বলকে চার্জ করার উদ্দেশ্যে কানেক্ট করা। সেই সময় ট্যাকলারের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ও নজর থাকবে বলের উপর। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের ট্যাকল করতে হয় পায়ের সোল দিয়ে। এর প্রক্রিয়া হল, দুই হাতে শরীর ব্যালান্স করে নন্-কিকিং পায়ের উপর ভর করে, শরীরকে স্লাইডিং করে সজোরে কিকিং পা-কে বাড়িয়ে দিয়ে বলকে আঘাত করতে হবে। এখানে যে ছবি দেওয়া হল, সেইভাবে কর্মানুষ্ঠান করার সময় শরীরের সেই ধরনের অবস্থা থাকবে।

এবার চারটি ছবি দেওয়া হল। প্রথমটি ব্লক ট্যাকলের অনুশীলন। দ্বিতীয়টি স্লাইডিং ট্যাক্লের প্রাথমিক অনুশীলন। ছবি অনুযায়ী বাঁ-হাত দিয়ে মাটিতে ভর করে। পায়ের উরু ও পায়ের বাইরের দিক মাটিতে অবস্থান করে ডান পা-কে বাড়িয়ে দিয়ে। ডান পায়ের সোল দিয়ে বলকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এই অনুশীলনটি নিশ্চল অবস্থায় হবে। কিন্তু সচল অবস্থায় হলেই তৃতীয় ছবির মত হবে। তখন হাত দিয়ে মাটিতে ভর করার প্রয়োজন হবে না। তৃতীয় ছবিটি হল, ইংল্যাণ্ড দলের বিশ্ববিখ্যাত লেফট উইঙ্গার বব্ চার্লটনের এক আন্তর্জাতিক খেলার সময় বিশেষ এক মুহূর্ত। ছবিতে বব্ চার্লটনের বাঁ পায়ে বল, আর বিপক্ষ দলের রাইট উইং ব্যাক পায়ের সোল দিয়ে স্লাইডিং ট্যাকল করতে দেখা যাচ্ছে। চতুর্থ ছবিটি হল, ট্যাকলার মাটিতে পড়ে স্লাইডিং ট্যাকল করে বলকে আউট অব প্লে করে দিয়েছে। এখানেও ট্যাকলারের পায়ের সোল ও শরীরের অবস্থা লক্ষ্য করার মত।

(চলবে)

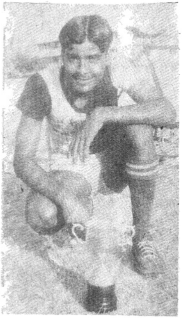


সেরা জেলা ফুটবলার কমল

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বাঁকুড়ার কমল ঘোষ সদ্য সমাপ্ত আন্তঃজেলা ফুটবলে পেয়েছে সেরা জেলা ফুটবলারের শিরোপা।

কমল বাঁকুড়া জেলা দলের হয়ে এবছরই খেলতে নামে। আগের খেলাগুলিতে ওকে একবারই মাঠে দেখেছি। কোনো অজ্ঞান কারণে গত জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায় কমল মাঠে সাইড লাইনের ধারে বসে বাংলার পরাজয় দেখেছে। প্রথম সুযোগেই কিস্তিমাত করেছে সে। 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম' -এর মতো কমল সবার হৃদয় চুরি করেছে। পশ্চিমবঙ্গ জেলা ক্রীড়া সংস্থা এবছর থেকে যে সেরা খেলোয়াড়ের রানিং ট্রফি চালু করেছে, প্রথমবার তা পেল কমল ঘোষ। এ ছাড়াও পুরস্কারস্বরূপ স্থানীয় সেনর‍্যালে সাইকেল ডিলার তাদের নতুন মডেল 'সাথী' সাইকেল একখানি দিয়েছে তাকে।

কমল বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজিয়েট স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। বাঁকুড়ায় আছে পাঁচ বছর। আগে থাকত বর্ধমানে। আদিবাড়ি কোচবিহারে। বাবা দেবীদাস ঘোষের বদলির চাকরি। কমলরা সাত ভাই, চার বোন। ভাইদের মধ্যে পঞ্চম সে। সবাই থাকে বি এস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের স্টাফ



কমল ঘোষ

কোয়ার্টাসে। কমল ফুটবল শুরু করেছে বাঁকুড়ার মৌসুমীতে। আন্তঃস্কুল ও সুব্রত কাপ ফুটবলে সে তার স্কুলের হয়ে খেলেছে। এবছর পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তঃজেলা জুনিয়র ফুটবলে কমল বাঁকুড়ার অধিনায়ক ছিল। মূলত রাইট হাফের খেলোয়াড় সে। এবার আন্তঃজেলায় প্রথম লেফট আউট খেলল। দু'পা সমান চলে। ঠিক সময় মত বল ছাড়তে পারে। পা-গ্নে দুরন্ত শট। ফাইনালে তার একটা চমৎকার ভলি বারে লেগে গড়িয়ে গড়িয়ে বাইরে চলে আসে। এই গোলটি পেলে আন্তঃজেলায় বাঁকুড়া চন্দননগরকে দু'গোলের ব্যবধানে পরাজিত করতে পারত।

কমলের বয়স এখন ষোল। উচ্চতা পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি। ৫৩ কিঃগ্রা ওজন দেহের অধিকারী কালো গাঁট্টাগোট্টা ছেলেটি খেতে খুব ভালবাসে। শিশুসুলভ মনের জন্য সে সবার প্রিয়। মৌসুমী ক্লাবের এক কর্মকর্তা জানালেন—'ক্লাব থেকে আমরা ওকে বুট, হোর্স, জার্সি সব দিয়েছি।' কমলের বাড়ির অবস্থা বেশ খারাপ। নিজের চেষ্টায় খেলা শিখেছে সে। এবার জেলা ফুটবল শুরুর আগে বাঁকুড়ার কোচ হরিশঙ্কর দাস ওকে তালিম দিয়েছেন। আরো ভাল কোচিং নিতে চায় কমল।

লাজুক কমল ভাল ক্রিকেটও খেলে। ভলিবলে সে ইতিমধ্যেই নাম করেছে। তবে ফুটবলই তার ধ্যান-জ্ঞান। সুরজিত সেনগুপ্ত তার প্রিয় খেলোয়াড়, স্বভাবতই 'লাল-হলুদ' তার দল। ভবিষ্যতে ফুটবল চালিয়ে যাবে কমল। চুনী গোস্বামী তার খেলা দেখে প্রশংসা করেছেন। এদের মর্যাদা রাখতে সে ভাল খেলতে চায়। ভাল প্রশিক্ষণ নিতে চায়। কিন্তু সে সব সুযোগ বাঁকুড়ায় সে পাবে তো?

রায়পুরে জুনিয়র গোল্ড কাপ ফুটবল



রায়পুর (মধ্যপ্রদেশ) থেকে গাজি এম আনসার ঃ প্রতি বছরের মত এবারেও রায়পুর বৈজনাথ পাড়ার এভার গ্রিন ক্লাব পরিচালিত ষষ্ঠ জুনিয়র গোল্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা হল।

রায়পুর, দুর্গ, রায়গড়, বিলাসপুর প্রভৃতি বিস্তীর্ণ জেলা নিয়ে সারা ছত্তীশ গড় থেকে মোট ৪২টি টিম খেলতে আসে।

যার মধ্যে এভার গ্রিন (রায়পুর), ইণ্ডিয়ান শান্তিবাল সমিতি, বিজয় ক্লাব (বৈরন বাজার), শহীদ স্মারক ক্লাব (গঞ্জপাড়া), হিরোজ ক্লাব (ভিলাই) জিমখানা, নিউ জিমখানা (বরোদা), বিলাসপুর এলেভেন (বিলাসপুর), ডায়মণ্ড ক্লাব (ছোটাপাড়া), ক্রান্তি ক্লাব (পণ্ডরী), অ্যাথলেটিক ক্লাব (রায়পুর), তাজ ক্লাব (রাজাতালাব), রাজকুমার কলেজ, হিরোজ অ্যাথলেটিক (ভিলাই), আজাদ ক্লাব (শঙ্করনগর), পি পি এস। শালিমার, সন্তোষ ক্লাব (রায়গড়), ইয়ং বয়েজ (মোমিন পাড়া) প্রভৃতি প্রধান।

গত অক্টোবর থেকে সকাল বিকেল মিলিয়ে ১৫/১৬ দিন খেলা হয়। কোয়ার্টার ফাইনালে ক্রান্তি ক্লাব বিলাসপুর এলেভেনকে টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হারায়। এবং সেরা কাব টাইব্রেকারে স্মার্ট ক্লাব বৈজনাথ পাড়াকে ৬-৫ গোলে হারায়। তৃতীয় দলটি অর্থাৎ হিরোজ ভিলাই অম্বর এলেভন (বইরঙ্গ বাজার)-কে ৩-০ গোলে হারায়। চতুর্থ দল হিরোজ অ্যাথলিট ভিলাই. রাজকুমার কলেজকে ৮-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে।

সেমিফাইনালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর হিরোজ ক্লাব ভিলাই সেরা ক্লাবকে ৩-০ গোলে হারায় এবং ফাইনালে খেলার পথ করে নেয়।

সেমিফাইনালে দ্বিতীয় দলের লড়াই হয় ক্রান্তি ক্লাব (পণ্ডরি) এবং হিরোজ অ্যাথলেটিক, ভিলাই-এর মধ্যে এবং হিরোজ অ্যাথলেটিক ৪-০ গোলে হারে। ফাইনালে প্রথমার্ধের কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ভিলাই-এর সেণ্টার ফরোয়ার্ড রাঘবেন্দ্র গোট নীচু টানা সটে পেনাল্টি সীমানার প্রায় ১০ গজ দূর থেকে একটি চমৎকার গোল করেন। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্রান্তি ক্লাব (১-১) গোল করে। অতিরিক্ত সময়েও কেউ গোল করতে পারেননি, ফলে টাইব্রেকারে ভিলাই (৬-৪) গোলে জেতে এবং ট্রফি পায়। ভিলাই হিরোজে যারা খেলেছেঃ অমর সিং রাটোর, অরুণ কুমার, তরুণ মাইতি, গোপীনাথ, রাঘবেন্দ্র গোট, কাঞ্চন ঘোষাল, প্রদীপ রাহা, পবন রাহা, ফিরোজ খান।

ক্রান্তি ক্লাবেঃ দিবাপুর সিংহ, হরিবন্ধু, উমাকান্ত, রামসুরেশ, সুরেশ নিহাল, সকীল, প্রকাশ সিন্ধে।

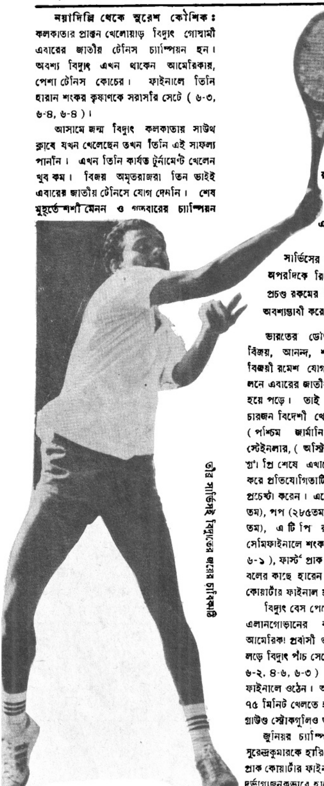
রেফারিঃ আবদুল কাজাদ আজাদ।

টুর্নামেণ্টে সেরা দলের পুরস্কার পায় বিলাসপুর একাদশ। সেরা খেলোয়াড় রায়গড়ের মুরলী ধর। সেরা গোলকিপার ভিলাই হিরোজ-এর অমর সিং রাটোর।

বিদ্যুৎ গোস্বামী জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়ন হলেন

নয়াদিল্লি থেকে সুরেশ কৌশিক : কলকাতার প্রাক্তন খেলোয়াড় বিদ্যুৎ গোস্বামী এবারের জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়ন হন। অবশ্য বিদ্যুৎ এখন থাকেন আমেরিকায়, পেশা টেনিস কোচের। ফাইনালে তিনি হারান শংকর কৃষ্ণাণকে সরাসরি সেটে (৬-৩, ৬-৪, ৬-৪)।

আসামে জন্ম বিদ্যুৎ কলকাতায় সাউথ ক্লাবে যখন খেলেছেন তখন তিনি এই সাফল্য পাননি। এখন তিনি কার্যত টুর্নামেন্ট খেলেন খুব কম। বিজয় অমৃতরাজরা তিন ভাই এবারের জাতীয় টেনিসে যোগ দেননি। শেষ মুহূর্তে শশী মেনন ও গতবারের চ্যাম্পিয়ন রমেশ কৃষ্ণাণও আসেননি। ফলে সবাই আশা করেন গতবারের রানার্স শংকর এবার খেতাবটি পাবেন। কিন্তু ফাইনালে বিদ্যুতের সার্ভিসের তীব্রতা এবং নিখুঁত ভলি অপরদিকে রিটার্ন সটগুলিতে শংকরের প্রচণ্ড রকমের ব্যর্থতা এই ফলাফল অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।



তীব্র সার্ভিসই বিদ্যুতের জয়ের চাবিকাঠি

ভারতের ডেভিস কাপ খেলোয়াড়রা বিজয়, আনন্দ, শশী, উইম্বলডন জুনিয়র বিজয়ী রমেশ যোগ না দেওয়ায় জিমখানা লনে এবারের জাতীয় টেনিসের রং ম্যাটমেটে হয়ে পড়ে। তাই উদ্যোক্তারা শেষ পর্যন্ত চারজন বিদেশী খেলোয়াড় পম্প ও ফার্স্ট (পশ্চিম জার্মানি) এবং রিনিঙ্গার ও স্টেইনলার, (অস্ট্রিয়া) প্রমুখকে বোম্বাই-র প্র' প্রি শেষে এখানে খেলানোর আয়োজন করে প্রতিযোগিতাটিকে বর্ণময় করে তোলার প্রচেষ্টা করেন। এদের মধ্যে রিনিঙ্গার (২২৫-তম), পপ (২৮৫তম) এবং স্টেইনলার (৪০০-তম), এ টি পি র‍্যাঙ্ক খেলোয়াড়। পপ সেমিফাইনালে শংকরের হাতে (৬-১, ৬-২, ৬-১), ফার্স্ট প্রাক কোয়ার্টার ফাইনালে নন্দন বলের কাছে হারেন। অন্য দুই বিদেশীও কোয়ার্টার ফাইনাল স্তরে হারেন।

বিদ্যুৎ বেস পেয়েছেন সেমিফাইনালে আর এলানগোভানের কাছে। এলানগোভানও আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয়। ১৬৫ মিনিট লড়ে বিদ্যুৎ পাঁচ সেটের লড়াইতে (৬-২, ৪-৬, ৬-২, ৪-৬, ৬-৩) এলানগোভানকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন। অবশ্য ফাইনালে তাকে মাত্র ৭৫ মিনিট খেলতে হয়। এদিন বিদ্যুতের গ্রাউণ্ড স্ট্রোকগুলিও ভালই হয়।

জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বাসুদেবন সুরেন্দ্রকুমারকে হারিয়ে। বাসু পুরুষ সিঙ্গলসে প্রাক কোয়ার্টার ফাইনালে রিনিঙ্গারের হাতে দুর্ভাগ্যজনকভাবে হারেন

পুরুষ ডাবলস চ্যাম্পিয়ন হন এলানগোভান ও নন্দন বল বিদ্যুৎ-শংকর জুটিকে হারিয়ে।

মেয়েদের বিভাগে মাত্র ১৬জন প্রতিযোগীর যোগদান অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। অমৃতা আলুওয়ালিয়া অনু পেশোয়ারিয়াকে হারিয়ে আবার সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। নরেশ কুমারের মেয়ে গীতা কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গেছেন। গীতা অবশ্য অমৃতার সঙ্গে জুটি বেঁধে কিরণ দেবী ও অনু পেশোয়ারিয়াকে হারিয়ে ডাবলস খেতাব পান।

প্রবীণ বিভাগে কে সি আনন্দ ফাইনালে হারান ওয়াসিম খানকে।

সাব-জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হন এস ইসরানি এইচ হেগড়েকে হারিয়ে।

এবারের টুর্নামেন্টে আম্পায়ারিং অত্যন্ত নিম্নমানের হয়েছে। লাইন জাজদের মান তো আরও জঘন্য। ফলে প্রায়শই খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাদের ঝগড়া হয়েছে।

সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া টেবল টেনিসে মনজিতের হার

সংবাদদাতা : সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ পেল তামিলনাড়ুর ভি চন্দ্রশেখর (ছেলে) শৈলজা সালোখে (মেয়ে) এবং সুজয় ঘোরপাড়ে (বালক)। এক সপ্তাহ ধরে সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা মধ্যপ্রদেশের ভিলাই ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়

দিল্লির মনজিত সিং দুয়া যিনি তামিলনাড়ুর ভি চন্দ্রশেখরকে হারিয়ে মহারাজা পুরথাপুরম কাপ জেতেন সেই দুয়া নিজের চ্যাম্পিয়নশিপ হারান চন্দ্রশেখরের কাছেই।

শৈলজার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কাশ্মীরা প্যাটেল। কাশ্মীরা মহারাষ্ট্রের উমা সাহাকে ৩—২, পশ্চিমবাংলার শ্যামলী চৌধুরীকে ৩—২ এবং আসামের মৌসুমী সাহাকে ৩—০-তে হারিয়ে ফাইনালে আসে।

ফাইনালে মহিলা সিঙ্গলসে শৈলজা শালোখে কাশ্মীরা প্যাটেলকে হারায় ২২—২০, ২১—১৩, ১১—১০-এ। অত্যন্ত নীরস প্রতিযোগিতা। প্রথম গেমটিতেই কাশ্মীরা একটু নড়াচড়া করেছিলেন তারপর যেন ফুরিয়ে যান। বয়েজ গ্রুপে সুজয় পার্থ বাসকে হারান ২২—২০, ১৮—২১, ২১—১৪ এবং ২১—১৬-তে।

কবাডির অনন্য রূপা শর্মা

বিদ্বর মিত্র ঃ গায়ের রং ফর্সা। বয়স ২২ বছর। ৫৯ কেজি ওজন, লম্বায় ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। পেটানো শরীর। বাঁ-হাতের কনুই-এর নীচ থেকে নেই। দেখলে মনে হবে বুঝিবা কোন দুর্ঘটনার ফল, আসলে তা' নয়, জন্ম থেকেই ওই অবস্থা। ওর নাম রূপনারায়ণ শর্মা। কবাডি জগতে ওকে সবাই 'রূপা' নামেই চেনে।

রাজস্থানের জয়পুরে বাবুলাল শর্মা ডাক ও তার বিভাগের একজন কর্মী। তার পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে রূপা পঞ্চম সন্তান। সবচেয়ে উদ্যোগী ও একরোখা ছেলে ওই রূপা। হাতের অসুবিধা নিয়েই তিনি শৈশব থেকে খেলাধূলা করেছেন। খেলেছেন ফুটবল বা অন্য কিছু। হাতের ওই অবস্থার জন্য তিনি ভীষণ লজ্জা পান। ওই প্রসঙ্গ উঠলে তিনি এড়িয়ে যেতে চান। নিজেকে যেন সব সময় অপরাধী মনে করে সঙ্কুচিত হয়ে থাকেন। নিজের ছবিও তুলতে দেন না।

কিন্তু এই ছেলেই কবাডি কোর্টে নামলে অন্য রূপ। নিজের রাজ্য রাজস্থানের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন মোট পাঁচবার। জুনিয়র ন্যাশনালের টাটানগর ও অমরাবতী আসরে রূপা ছিলেন তার রাজ্য দলে অপরিহার্য।

স্থানীয় টুর্নামেন্টে ও শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছেন ৫০টি। সর্বভারতীয় পর্যায়ে বিজনোর, দিল্লি, পুনে, ইয়তমল, নাগদা আসরে তিনি শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছেন। এখনও পর্যন্ত রূপা দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেননি। কিন্তু তিনি আশাবাদী জাতীয় দলের হয়ে খেলতে চান, আশা সে সুযোগ তিনি পাবেন।

'হাতের জন্য কবাডি খেলতে অসুবিধা হয় না।'


রূপনারায়ণ শর্মা

'অসুবিধা হয়। কিন্তু খেলবার সময় কোর্টে আমার ও'সব মনে থাকে না।' রূপা মাথা নীচু করে উত্তর দেন। 'অসুবিধা জরুর হোতি হ্যায়। পরন্তু আগে ইস বারে অধিক না পুছে তো আচ্ছা। কিঁউ কি জব ম্যায় একেলা হু', - তো মুঝে আপনে আপসে ঘৃণা হোনে লগতি হ্যায়।'

ও নিয়ে আর কোন প্রশ্ন নয়।

ফুটবল ছেড়ে কবাডিতে কেন এলেন? 'কবাডির প্রতি ঝোঁক ছিল প্রথম থেকেই। কিন্তু নানা কারণে প্রথমে কবাডিতে যাইনি। কিন্তু ক্রমে দেখলাম চারপাশের কবাডি খেলোয়াড়দের। তারা নানা সম্মান এনে দিচ্ছে দল ও রাজ্যকে। ওদের কত সম্মান, আদর। ইচ্ছা হোল এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম কবাডি খেলতে হবে। ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে ফুটবল ছেড়ে কবাডি খেলতে শুরু করলাম। আজ কবাডি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারি না। ভাবি না।'

এই মুহূর্তে তিনি বি কম দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ও আয়কর বিভাগের করণিকের চাকরি—দুটো বজায় রেখেই তিনি খেলে চলেছেন, ও খেলবেন।

রূপা যে কোন পজিসনে খেলতে ওস্তাদ। তবে আসলে ওর প্রিয় 'পজিসন' লাইনম্যান বা প্রান্তের। ●


'রূপা' কবাডি কোর্টে

শিলচরে ফুটবল



নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ৩২ দিন ধরে ক্যাপ্টেন নলিনীমোহন গুপ্ত ফুটবল টুর্নামেন্ট জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন মাঠে হয়ে গেল। দু'দিন (৫ ও ৬ ডিসেম্বর) ফাইনাল খেলা ড্র থাকার পর কলকাতার মিলন সমিতি ও বিহার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ (পুর্ণিয়া) যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষিত হয়েছে।

সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বরদলুই ফুটবল টুর্নামেন্টের পরে এই শিলচর টুর্নামেন্টের স্থান। তবে এবছর অনিবার্য কয়েকটি কারণে বাইরের কিছু নামী দল যোগ দিতে পারেনি।

৪ নভেম্বর টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন কাছাড়ের জেলাশাসক সি বাবু রাজীব। উদ্বোধনী ম্যাচে স্থানীয় প্রথম ডিভিসন লিগ চ্যাম্পিয়ন ই'টখোলা অ্যাথলেটিক ক্লাব টাইব্রেকারে বদরপুর ইয়ং মেনস ক্লাবকে পরাজিত করে।

১৮ বছরের এই টুর্নামেন্টের প্রথম ফাইনাল ছিল অত্যন্ত নিরুত্তাপ। মিলন সমিতি দলে কলকাতার ইস্টবেঙ্গল, জর্জ টেলিগ্রাফ এবং অন্যান্য বড় দলের কয়েকজন নামী খেলোয়াড় ছিলেন। ঢিমেতালে খেলায় ৭০ মিনিট কোন গোল হয়নি। দু'দিনই বিহার দলের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও তাদের ফরোয়ার্ডদের লক্ষ্য ভ্রষ্টতার জন্য গোল হয়নি।

বিহার দলের পদ্ম সিং, রাণাপ্রতাপ সিং ও বি এন গাঙ্গুলির খেলা সবার প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু নামী খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও মিলন সমিতি এলোমেলো খেলার জন্য সুফল পায়নি। তবে প্রবীণ শিশির গুহ দস্তিদার, অধিনায়ক সৃজন দাস ও বাসু চৌধুরী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন বিহারের রাণাপ্রতাপ সিং। নিয়মানুবর্তিতার জন্য শ্রেষ্ঠ দল নির্বাচিত হয়েছে মিজোরাম আর্মড পুলিশ। দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন কাছাড়ের জেলা শাসকের স্ত্রী। টসে জিতে ট্রফিটি প্রথম ছ' মাস রাখার অধিকার পায় বিহার দল। যুগ্ম-বিজয়ী হওয়ার ফলে এবার রানার্স আপ (খগেশ চন্দ্র সেন) ট্রফি কেউ পাচ্ছে না।

মিলন সমিতি—অমিত গুহ, সুদীপ সরখেল, শংকর সাহা, বাসু চৌধুরী, দিলীপ দাস, সনাতন চৌধুরী (নির্মল পাল), সুবিমল ঘোষ, দিলীপ দত্ত, বাদল ভট্টাচার্য, শিশির গুহ দস্তিদার, সৃজন দাস।

বিহার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ (পূর্ণিয়া)—পদ্ম সিং, বি এন গাঙ্গুলি, রাণাপ্রতাপ সিং, এস এন দাস, আর জি সিং, এন কে সিং, আর কে শা, মহঃ ইফাজত আলী, মহঃ সইব (অধিনায়ক) কে এন সিং, পি কে দে।

জুনিয়র দেহসৌষ্ঠব ও যোগাসন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ২৪ পরগণা জুনিয়র দেহসৌষ্ঠব ও যোগাসন প্রতিযোগিতার জমজমাট আসর বসে এবছর ইছাপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে। ১২টি জেলা থেকে প্রায় ২২০ জন প্রতিযোগী এতে অংশ নিয়েছিলেন।

১৯৭৯ সালে মাসলম্যান অফ জুনিয়র বেঙ্গল উপাধি লাভ করেন হুগলীর শম্ভু কোলে। দেহসৌষ্ঠবে ২৪ পয়েন্ট পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়নশিপের মর্যাদা পায় দক্ষিণ কলকাতা। বিভিন্ন ওয়েট গ্রুপে যারা প্রথম হলেন:

ফ্লাই—শম্ভু কোলে (হুগলী), ব্যাণ্টম—স্বপন ঘোষ (মধ্য কলকাতা), লাইট—সরোজ দত্ত (দক্ষিণ কলকাতা), মিডল—দিব্যেন্দু মিত্র (দক্ষিণ কলকাতা), লাইট হেভি—সঞ্জীব বোস (হাওড়া)।

যোগাসন প্রতিযোগিতায় ছেলেদের বিভাগে হাওড়ার অনুজিৎ ঘোষ ও মেয়েদের বিভাগে দক্ষিণ কলকাতার সুজাতা ভট্টাচার্য চ্যাম্পিয়ন হয়। অর্জুন পুরস্কার জয়ী মলয় রায়কে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

শব্দ জব্দ

সুব্রত চ্যাটার্জি,
সাউথ গড়িয়া যদুনাথ বিদ্যামন্দির,
(হায়ার সেকেণ্ডারি),
পোঃ-সাউথ গড়িয়া, ২৪-পরগণা।

পাশাপাশি

২। ১৯৬৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বের প্রতিটি খেলায় গোল করেছিলেন পশ্চিম জার্মানির এই মিড ফিল্ডার।

৫। সদ্য সমাপ্ত ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের চতুর্থ টেস্টে ফলোঅনকারী আগন্তুক দলকে অবধারিত হারের হাত থেকে বাঁচাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান।

৬। গত একযুগ ধরে সমান দাপটে কলকাতা ময়দানের তিন বড় দলের হয়ে খেলে যাচ্ছেন এই খাটো চেহারার ফরোয়ার্ড।

৮। ১৯৩৩ সালে প্রথম ডিভিসন ফুটবল লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা।

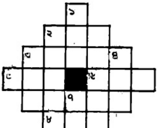
উপরনীচ

১। ১৯৭৪ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলে বিজয়ী দলের পক্ষে জয়সূচক গোলটি করেছিলেন এই বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়।

৩। ১৯২০-২১ সিরিজে দেশের মাটিতে মেলবোর্ন টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যাণ্ডের ৯ জন ব্যাটসম্যানকে ধরাশায়ী করেছিলেন এই অস্ট্রেলিয়ান স্পিনার।

৪। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে পরপর দুবছর প্রথম ডিভিসন ফুটবল লিগে সবচেয়ে বেশী গোল করেছিলেন এই ফুটবলার।

৭। ইংল্যাণ্ডের এই বিশ্বখ্যাত দ্রুতগতি বোলার ১৯৫২ সালে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ভারতের বিরুদ্ধে ৩১ রানে ৮টি উইকেট পেয়েছিলেন।



এ ছকটি অবশ্যই পূরণ করে শব্দ জব্দের সঙ্গে পাঠান

নাম ________

অভিভাবকের নাম ________

ঠিকানা ________

বিদ্যালয় ________

বিদ্যালয় প্রধানের স্বাক্ষর ________

বিদ্যালয়ের সীলমোহর ________

রাজ্য ভারোত্তোলনে সব রেকর্ডই নতুনদের



লাইট ওয়েটে চ্যাম্পিয়ন তরুণ কান্তি ঘোষ, বাঁদিকে সুবোধ কর ডানদিকে বিমল মল্লিক

সংবাদদাতা ঃ হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরে বিশ্বকল্যাণ সংঘের ব্যবস্থাপনায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা হল। প্রায় ৩০০ প্রতিযোগী সিনিয়র ও জুনিয়র বিভাগে অংশ গ্রহণ করেন। মোট ৫টি নতুন রাজ্য রেকর্ড স্থাপিত হয়। সব থেকে উল্লেখযোগ্য প্রায় সব রেকর্ডই একেবারে নতুন ভারোত্তোলকরা স্থাপন করেছেন এবং এদের রেকর্ডগুলির ৪টি প্রায় ভারতীয় রেকর্ড স্পর্শ করেছে। এ রাজ্যের ভারোত্তোলনে এটি সুখের খবর। হতাশার কথা, একদা যে ইস্টার্ন রেল ওজন তোলায় সেরা ছিল, এবার তাদের চিহ্নটি যেন দেখা গেল না।

বাংলার জুনিয়র ভারোত্তোলন দল খুব যত্ন ও হিসাব করে গঠন করা হলে, এবং এখন থেকেই নির্বাচিত ভারোত্তোলকদের শিক্ষণ শিবিরে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে নিশ্চিতভাবে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় দলগত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এবারের প্রতিযোগিতায় মোট ৯টি বিভাগে সিনিয়র ও জুনিয়রদের প্রতিযোগিতা হয়েছে। ৫টি রাজ্য রেকর্ড ছাড়াও অন্য যে সব প্রতিযোগী অত্যন্ত উঁচুমানের ফল দেখান তারা ঃ ফ্লাইওয়েটে অপূর্ব ব্যানার্জি, ব্যান্টামওয়েটে কমলা সাঁতরা, ফেদারওয়েটে অশোক ঘোষ, লাইটওয়েটে তরুণকান্তি ঘোষ, মিডলওয়েটে শেখর সাহা, লাইটহেভিতে প্রবীর বিশ্বাস। এরা সকলেই জুনিয়র প্রতিযোগী। সিনিয়রদের মধ্যে বাবুলাল মুখার্জি, সুশীল পাঠক, বিমান মল্লিক, সজল ব্যানার্জি, ভবসিন্ধু মণ্ডল, সুভাষ ঘোষ, তপন ঘোষ, প্রদীপ মণ্ডল ও অমল ঘোষও বেশ আশাপ্রদ ফল দেখিয়েছেন।

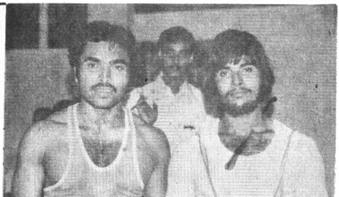
উদ্যোক্তারা সংবর্ধনা জানান গোপাল খাঁড়া, গোপাল চক্রবর্তী, সুবোধ চৌধুরি, ধীরেন সরকার, রবীন বাগচি, সুধাংশু ভাদুড়ি, অমূল্য চক্রবর্তী, অমর ধাড়া, রঘুনাথ চ্যাটার্জি, কমল ভাণ্ডারি, তলক ঘোষ, তরুণ দাস, নীলমণি দাস, দুলাল লোধচৌধুরি, অনিল মণ্ডল, অনিল পাল, প্রশান্ত আঢ্য, সুনীল মুখার্জি, ভোলানাথ গুঁই প্রমুখকে। কয়েকজন ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি।

বিভিন্ন ওয়েটে যারা প্রথম হয়েছেন ঃ

(জুনিয়র)

* ফ্লাই—অপূর্ব ব্যানার্জি (সাউথ ইস্টার্ন রেল)।

* ব্যান্টম—কমলাকান্ত শর্মা (হাওড়া)।



মিডল ওয়েটে শেখর সাহা (বাঁদিকে) ও ফেদারওয়েটে অশোক ঘোষ / শঙ্কর নাগ দাস

ফেদার—অশোক কুমার ঘোষ (হাওড়া)।

* লাইট—তরুণকান্তি ঘোষ (সাউথ ইস্টার্ন রেল)।

* মিডল—শেখর সাহা (ঘোষেজ কলেজ)।

* লাইটহেভি—প্রবীর বিশ্বাস (সাউথ ইস্টার্ন রেল)।

মিডলহেভি—শৈলেন দাপাশি (সাউথ ইস্টার্ন রেল)।

হেভি—পান্নালাল মণ্ডল (হাওড়া)।

(সিনিয়র)

ফ্লাই—বাবুলাল মুখার্জি (হাওড়া)।

ব্যান্টম—সুশীল পাঠক (পি অ্যাণ্ড টি)।

ফেদার—বিমান মল্লিক (বর্ধমান)।

লাইট—সজল ব্যানার্জি (পি অ্যাণ্ড টি)।

মিডল—ভবসিন্ধু মণ্ডল (সাউথ ইস্টার্ন রেল)।

লাইটহেভি—সুভাষ ঘোষ (সাউথ ইস্টার্ন রেল)।

মিডলহেভি—তপন ঘোষ (সাউথ ইস্টার্ন রেল)।

হেভি—প্রদীপ মণ্ডল (সাউথ ইস্টার্ন রেল)।

সুপারহেভি—অমল ঘোষ (সাউথ ইস্টার্ন রেল)।

[* তারকা চিহ্নিতরা রেকর্ড করেছেন।]

আদ্রায় ঘোষ কাপ ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পুরুলিয়ার ঐতিহ্যশালী আশুতোষ ঘোষ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা সদ্য শেষ হয়েছে। আদ্রা নর্থ ইনস্টিটিউট পরিচালিত এই প্রতিযোগিতায় ২৭টি দল অংশ নিলেও শেষ পর্যন্ত আটটি দল আসেনি। এবছরের সেরা খেলাটিতে কলকাতার সোনালী শিবির নেতাজীনগর কলেজকে ন্যূনতম গোলে পরাজিত করে। সেমিফাইনালে ব্যারাকপুরের প্রগতি সংঘ মেদিনীপুর রিক্রিয়েশন ক্লাবকে ২—০ গোলে ও জামসেদপুর এগ্রিকো স্পোর্টিং ক্লাব কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাবকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। ৯ ডিসেম্বর আট হাজার দর্শক পূর্ণ আদ্রা সেরসা স্টেডিয়ামে ব্যারাকপুরের প্রগতি সংঘ এক উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনালে জামসেদপুরের এগ্রিকো স্পোর্টিং ক্লাবকে একমাত্র গোলে পরাজিত করে এই প্রথমবার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করলো। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন কল্যাণ দে। এগ্রিকো দল বেশ কয়েকটি সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করে। সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পান প্রগতি সংঘের সজল দাস। খেলা শেষে স্বর্গীয় আশুতোষ ঘোষের ভ্রাতৃবধূ অশীতিপর বৃদ্ধা শ্রীমতী শেফালী ঘোষ বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। ■

ময়দানের কড়চা

পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি লম্বা, ফর্সা রঙ সুগঠিত শরীর, নাকের উপর মোটা ফ্রেমের চশমা, পোশাকে-আশাকে ফিটফাট, ছিমছাম —এক কথায় যাকে বলা যায় সুপুরুষ। ৩৯ বছর বয়স্ক এই মানুষটির দেখা পেতে হলে আপনি সি এ বি ক্লাব হাউসে চলে এসে সহঃসম্পাদকের চেয়ারটির দিকে তাকান, কিম্বা এন কে গোসেন কোম্পানির 'ম্যানেজিং ডাইরেক্টর' তকমা আটা ঘরটির দিকে চোখ ফেলুন। উপরোক্ত দুটো পদাধিকারী হলেন একই ব্যক্তি। নাম—চণ্ডী গাঙ্গুলি।

গোসেন কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বা সি এ বি-র অবৈতনিক সহঃসম্পাদক—শুধু এটাই চণ্ডী গাঙ্গুলির একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি ক্রিকেট খেলেছেন লম্বা সময়কাল—দু'বছর সাউথ সাবারবন, দু'বছর ইস্টবেঙ্গল এবং পরের আট বছর এরিয়ান ক্লাবে। তার-মধ্যে পর পর পাঁচ বছর এরিয়ানের ক্যাপ্টেন। ব্যাট হাতে রান করেছেন, বল ওপেন করে উইকেট পেয়েছেন। তবু কোনদিন রঞ্জিতে বাংলা টিমে আসেননি, যদিও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে কলকাতার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তবে বাংলা দলে খেলার সুযোগ না পেলেও চণ্ডীবাবু এখন বাংলা ক্রিকেট সংস্থারই অন্যতম কর্ণধার। খেলোয়াড় হয়ে পরে সেই খেলারই রাজ্য সংস্থার অন্যতম কর্মকর্তা হওয়ার নজীর ভূরি ভূরি নেই।

এরিয়ানের প্রতিনিধি হয়ে চণ্ডী গাঙ্গুলি সি এ বি-তে প্রথম আসেন ৭৩-'৭৪-এ, সে বছর তিনি ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার। '৭৪-'৭৫-এ হলেন গ্রাউণ্ড কমিটির চেয়ারম্যান। এবং তারপর থেকে চণ্ডীবাবু সি এ বি-র সহঃসম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করে আসছেন।

'৬৭ সালে তিনি প্রিন্টিং টেকনোলজি পড়তে লণ্ডনে যান। এবং সেখানে প্রিন্টিং স্কুলের হয়ে কিছু ম্যাচে অংশ নেন। বছর দুয়েক আগে এম সি সি তাকে অনারারি সদস্যপদ দিয়েছে যে সম্মান এতাবৎ খুব কম ভারতীয়ের ভাগ্যেই জুটেছে।

পাঁচ ভাই ও সাত বোনের মধ্যে চণ্ডীবাবু সকলের বড়। বাবার নাম এন কে গাঙ্গুলি। প্রিন্টিং-এর বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান গোসেন কোম্পানি তার নামেই। ব্যবসাটা পারিবারিক। বাবার বয়স হয়েছে। তাই পাঁচ ভাই এখন ব্যবসাটা দেখছেন।

বড় বলে চণ্ডী গাঙ্গুলির দায়িত্ব অনেক। দু'ছেলের বাবা তিনি। বড় রাজের বয়স ১৩, ছোট মহারাজের বয়স ৬। সি এ বি-র মত বনেদী গাঙ্গুলি পরিবারেরও অন্যতম কর্ণধার তিনি।

তবে এখন সি এ বি-তেই তাকে বেশী সময় দিতে হচ্ছে। চণ্ডীবাবু ক্রিকেট ভালোবাসেন। তার উপর তার কাঁধে দায়িত্বভারও কম নয়। সামনে আবার পাকিস্তান টেস্ট।

শিলং-এ পি কে

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে প্রদীপ ব্যানার্জি দিন কয়েকের জন্য শিলং ঘুরে এলেন। সেখানে যে স্কুলটির ফুটবল টিমকে প্রদীপ মাঝেমধ্যে দেখাশোনা করেন সেই স্কুলের ফাদারেরই আমন্ত্রণ। যাই যাই করেও যাওয়া হচ্ছিল না। বারকয়েক তো টিকিটই ফেরৎ দিতে হল। নভেম্বরের শেষে ডুরাণ্ড জিতে কলকাতা ফিরেই পি কে মনস্থির করে ফেললেন। চারদিনের ছুটি নিয়ে সোজা শিলং।

সুব্রত কাপ খেলে শিলং-এর ওই মিশনারি স্কুলটি। গত ফুটবল সিজনে স্কুলের ফুটবল দলটি কলকাতায় এসেছিল একবার। হাজার কাজের মাঝেও পি কে দেখেশুনে দিয়েছিলেন সেবার। ওরাও ভোলেননি পি কে-র আন্তরিকতা। প্রতিদান নয়, পি কে-কে আরও কাছে পাওয়া, তাই এই আমন্ত্রণ।

খেলা কোটলায়, হাততালি ইডেনে

হাজার মাইলের ব্যবধানে দুটি নামকরা ক্রিকেট মাঠে খেলা হচ্ছে, এক মাঠে টেস্ট ম্যাচ অন্য মাঠে একটা প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচটায় তৃতীয় শ্রেণীর খেলা দেখেও দর্শকরা মাঝেমধ্যেই হাততালি দিয়ে উঠছে, এমন তাজ্জব কাণ্ড ভাবা যায়!

কিন্তু তাই হচ্ছিল সেদিন। ইডেনে দলীপ ট্রফিতে দক্ষিণাঞ্চল পূর্বাঞ্চল ম্যাচের তৃতীয় দিন ছিল দিল্লি টেস্টের শেষদিন। ইডেনে যারা খেলা দেখতে এসেছিলেন তাদের মন পড়েছিল কিন্তু ফিরোজ শা কোটলায়। বেঙ্গসরকার—যশপাল—কপিলের ব্যাটে রান উঠছিল যত ট্রানজিস্টরে কান রেখে বসে থাকা দর্শককুলের হাততালি পড়ছিল ততই ইডেনে।

বলা নেই কওয়া নেই, দুমদাম হাততালিতে ইডেনের খেলোয়াড়দের অস্বস্তিও কম ছিল না। দুবার ভেঙ্কটরাঘবন, একবার নরসিমা রাও বল ডেলিভারি দেওয়ার মুখে হাত গুটিয়ে নিলেন আচমকা চীৎকার আর হাততালিতে ঘাবড়ে গিয়ে। উদয়ভানুর সেঞ্চুরি হল যখন তখনও দারুণ হৈ চৈ হল। কে জানে উদয় কি ভাবল, তার সেঞ্চুরি না বেঙ্গসরকারের বাউণ্ডারি কিসের স্বীকৃতি দেওয়া হল।

তিন মিনিটের তক্কো

সুরজিত না প্রসূন কে রোগা, এই নিয়ে সেদিন ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে গেল কালিঘাট বাস স্টপেজের পাশের ফুটপাথে। সময়টা সকাল, তারিখ সাতই ডিসেম্বর।

হকারদের পেতে রাখা সারি সারি তক্তাপোষের একটা দখল করে বসেছিল ক'টি তরুণ। হঠাৎই কথাটা উঠল। মুহূর্তে দু'ভাগ হয়ে গেল দলটি। কে রোগা এই নিয়ে তর্কটা জোর লেগে গেল তারপর। সুরজিত-পক্ষ জোর দাবী তুলল সুরজিতই মোটা। প্রসূন-পক্ষ হুঙ্কার দিল—'না প্রসূন'। একজন বলল 'মেপে দেখ।' অন্য পক্ষের গলা চড়ল,'যা যা তোরা মাপ গে।' প্রসূন-তরফ সুর নরম করল এবার 'ছবি দেখিসনি কাঁধটা প্রসূনের চওড়া না।'



সুরজিত-পক্ষ অন্য কথায় চলে গেল এবার। 'ছোটে কি, যেন রাজধানী এক্সপ্রেস।' প্রসূন-তরফ আর এক বাঁকে গেল। 'বাইরের মাঠে চেনে তো গৌতমকে।' আবার তপ্ত হয়ে উঠল ও তরফ। 'যা যা ফোটাসনি।'

হঠাৎই যেমন ঝড় উঠেছিল তেমনি যেন মিইয়ে গেল আবার। দু'পক্ষই চুপচাপ। বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন ছেঁড়া চট, তেরপলের পাশ দিয়ে উঁকি মারছিলেন এতক্ষণ। তিন মিনিটের তক্কো শেষ হতে তারা আবার মনযোগ দিলেন বাস আসছে কিনা তা দেখায়।

ওলিম্পিকের গপ্পো

লেখা : অশোক চট্টোপাধ্যায় ও রেখা : জি সান্ত্রা

৩১



গুজব না সত্যি

খবর্দার ঃ 'কে কি বলল। কে কি লিখল—মার গুলি ; আমি বলছি পি কে ইস্টবেঙ্গলে আসছে না। মোহনবাগান তাকে ছাড়তেই হবে, অতএব তুমি লিখে নাও, আগামী বছর পি কে মহমেডান স্পোর্টিং-এ কোচ হয়ে যাচ্ছে।' কথাটা শুনে একবার ঢোক গিলে দু' মিনিট ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রইলাম অরুণের দিকে।

আমার চোখে কি অবিশ্বাস ছিল ? হয়ত ছিল, অরুণ খেঁকিয়ে উঠে বলল—'এই তো তোমাদের দোষ পাঁচুদা। খবর জানতে চাইবে। জেনুইন খবর দেব, কোনটাই বিশ্বাস করবে না—'

'না আসলে তা নয়। ব্যাপারটা মানে হিসাবটা ঠিক মেলাতে পারছিলাম না।' ওকে শান্ত করতে চাই। অরুণ শান্ত হল এবং ও ওর হিসাবের খাতা মেলে ধরল আমার সামনে। ও যা বলেছিল তাকে গুছিয়ে সামনে নিয়ে বসলাম।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বর্তমান কর্মকর্তারা বুঝতে পেরেছেন তাদের আসন টলায়মান। এই আসনকে সুস্থির করতে তারা একজন চোস্ত প্লেয়ার-গেটারকে বাজারে ছেড়ে দিয়েছেন, তিনি ইতিমধ্যেই অন্য দুই বড় ঘর ভাঙবার ব্যবস্থা পাকা করেছেন। সেই ব্যবস্থা গত মোহনবাগান থেকে আসছেন গৌতম সরকার, সুধীর কর্মকার। মানস বিদেশ আসছে না কারণ সুরজিত বিদেশে যাচ্ছেন না। তাকে ইস্টবেঙ্গল ছাড়বে না। ছাড়লেও সুরজিত মোহনবাগানে যাবেন না, যাবেন মহমেডান স্পোর্টিং-এ। মহমেডান স্পোর্টিং থেকে আসছেন নাসির আমেদ, ফিলিপস ও দীনকর।

দল ছাড়ছেন কারা ? ভাস্কর, মনোরঞ্জন ও চিন্ময়কে ইস্টবেঙ্গল আর ধরে রাখতে পারবে না। মিহির দল ছাড়ছেনই। তার পছন্দ মোহনবাগান। কিন্তু মোহনবাগান গতবছর ওর সম্বন্ধে আগ্রহী হলেও এই মুহূর্তে ততটা গা করছে না। মিহির কিন্তু আশা ছাড়েননি।

ডেভিড উইলিয়মস আর কলকাতায় থাকতেই তত আগ্রহী নন, তিনি দেশে ফিরে যেতে চান। দল তাকে পুরো টাকা না দেওয়ায় তিনি অপেক্ষা করছেন। টাকা না পেয়ে অনেকের মত ক্ষুব্ধ হলেও সাব্বির শেষ পর্যন্ত দল ছাড়বেন না। কারণ তার দায়িত্ব নিয়েছেন ক্লাবের একজন কর্মকর্তা।

কিন্তু তিন পাঞ্জাবী কি করবেন ? এদের ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো। ওদের দলে রাখলে বাঙালী ছেলেরা প্রায় সবাই দল ছাড়বেন ; এই সম্ভাবনা দেখে কর্তারা আর



ওদের দিকে বেশী নজর দিচ্ছেন না। গুরদেব ও হরজিন্দর এবং মনজিত এ'রাজ্যে আর খেলবেন না ঠিক করে ছাড়পত্রে সই করেছিলেন। তখন প্রত্যাহারের একটি করে ফর্মেও আগাম সই করিয়ে রেখেছিলেন একজন কর্মকর্তা। গুরদেব পাঞ্জাবে ফিরে চাকরি শুরু করবার পরই ওই সই করা ফর্ম জমা দিয়ে দেন কর্মকর্তাটি। এতে গুরদেব ক্ষুব্ধ, ক্ষুব্ধ কয়েকজন কর্মকর্তা। গুরদেব-হরজিন্দর যদি কলকাতায় খেলেন তবে ইস্টবেঙ্গলে নয়, সম্ভবত মহমেডানেই ওরা খেলবেন।

ইস্টবেঙ্গলের প্রধান সমস্যা তো কোচ, তার সমাধান কিভাবে হবে ? পি কে আসছেন না। কারণ তাহলে গৌতমকে পাওয়া যাবে না। দু'জনের সম্পর্কটা এবারে ডুরাণ্ড খেলতে গিয়ে আরও খারাপ হয়েছে। সুধীর কর্মকারও পি কে-র প্রতি প্রসন্ন নন। তাছাড়া যতটা সম্ভব বেশী মূল্য দিয়েও মোহনবাগান পি কে-কে রাখতে চাইবে। কিন্তু তার পক্ষে আর বোধহয় দলে থাকা সম্ভব নয়। তিক্ততা বেড়েছে। যে পরিস্থিতিতে পি কে একসময় ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে এসেছিলেন, সেই পরিস্থিতি আজও তার সামনে। ইস্টবেঙ্গল-ব্যক্তিত্ব শান্ত মিত্র বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন ফুটবল প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ নিয়ে। ইস্টবেঙ্গলের পরবর্তী কোচ ওই শান্ত মিত্র। পি কে অতএব মহমেডান স্পোর্টিং-এ যাচ্ছেন।

মহমেডান স্পোর্টিং-এ বেশ তোলপাড় হতে চলেছে। কোচ অমল দত্ত থাকছেন না। তার ভাগ্য তাকে থাকতে দেবে না। দল থেকে সরে যাচ্ছেন হাবিব মিঁয়া ও তার সহোদর আকবর। নাসির, ফিলিপস ও দীনকর অবশ্যই দল ছাড়ছেন। ইস্টবেঙ্গল অমলরাজকেও হাত করেছে। মঈদুলকে যে টোপ দেওয়া হয়েছে তাতে তিনিও দল ছাড়বেন। তাহলে ? সমরেশ চৌধুরী এবার দলের হাল ধরতে এগিয়ে এসেছেন, মদত—কয়েকজন প্রভাবশালী কর্মকর্তার। সমরেশ আশা করছেন ভাস্কর, চিন্ময়, সুরজিত, শ্যামল ঘোষ, দিলীপ পালিত, মিহির বসুকে নিয়ে এবারের মহমেডান দল বেশ জবরদস্ত দল হবে। এবং এমন একটা দলের কোচিং-এর দায়িত্ব নিতে কোচ পি কে অরাজি হবেন না। হ্যাঁ দিলীপ দলে থাকা সত্ত্বেও। অবশ্য দিলীপ যদি তেমন নিশ্চিন্ত হন যে পি কে দল ছাড়ছেন তাহলে তিনি দল ছাড়বেন না। তবে দিলীপের ইচ্ছা ইস্টবেঙ্গলে খেলার।

মোহনবাগানে কোচিং-এর দায়িত্ব কে নেবে ? এক্ষেত্রে শৈলেন মান্নার আশা পি কে-র ফি বাড়াবার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তাতে ফল পাওয়া যাবে। ইস্টবেঙ্গলের মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কর্তারা কথা বলতে তত আগ্রহী নন। ঘর ভাঙছে একথা ভাবতে ওরা রাজী নন—মোহনবাগান নাকি অটুট থাকছে। 'বুঝলে পাঁচুদা ওরা স্বপ্ন দেখছে।' সমস্ত হিসাব নিকাশের পর এই হল অরুণের ক্যালকুলেশন। আমি ভাবি ছেলেটা পারেও বটে। কি স্পেকুলেশন ! হলই বা তা—।

মল্লিকা দাস বৃত্তি পেল

স্টাফ রিপোর্টার ঃ লায়ন্স ক্লাবের জুনিয়র শাখা লিও ক্লাবের তরফ থেকে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স সংস্থা মারফত ১৪ বছরের মেয়ে অ্যাথলেট বারুইপুরের মল্লিকা দাসের হাতে ৫০ টাকার এক মাসিক বৃত্তি তুলে দেওয়া হয়। মল্লিকা এবছর হাইজাম্প ও লংজাম্পে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

চিরঞ্জীব মস্কো গেলেন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আনন্দবাজার পত্রিকার প্রখ্যাত ক্রীড়া-সাংবাদিক চিরঞ্জীব এখন মস্কোয়। সোভিয়েত রাশিয়ার আমন্ত্রণে তিনি গত ১১ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে মস্কোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। তিনি ওখানে গিয়ে আগামী অলিম্পিকের প্রস্তুতি এবং সব কাজ কি রকম এগোচ্ছে, তা দেখবেন। তার এই মস্কো যাত্রা উপলক্ষে গত ৮ ডিসেম্বর রাজ্য অ্যাথলেটিক্স সংস্থা সিটি অ্যাথলেটিক টেন্টে চিরঞ্জীবকে আন্তরিক সংবর্ধনা জানান। সংস্থার তরফ থেকে তাকে একটি সোয়েটার উপহার দেওয়া হয়। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অরুণ ব্যানার্জি বললেন—বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তারা যেমন খেলাধূলা ভালোবাসেন, ক্রীড়া-সাংবাদিকদের স্পোর্টসের প্রতি ভালোবাসা তার চেয়ে কম নয়। ●

টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম একশো বছরে সতেরোজন অলরাউণ্ডারের কে সেরা (১০)

দিলীপ সরকার ঃ টেস্ট ক্রিকেটে এক হাজার রান ও একশো উইকেটের দুর্লভ 'ডাবল' পেলেন কিথ মিলার ১৯৫২-'৫৩ সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। মেলবোর্নের দ্বিতীয় টেস্টে। তিন বছর আগে আফ্রিকা সফরে মিলার যথার্থই একজন সেরা অল-রাউণ্ডারের ভূমিকায় দাপিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু দেশের মাটিতে মিলার পাঁচ টেস্টের সিরিজে মাত্র পাঁচ ইনিংসে বল করতে পেরেছিলেন। তবুও মিলারের দখলে এসেছিল তেরটি উইকেট। বোলিং গড়ে মিলার ছিলেন দুই তরফেই সেরা। অসুস্থ শরীর নিয়েও দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়দের কাছে কিথ মিলার ছিলেন বরাবর ভয়ের কারণ।

ব্রিসবেনের প্রথম টেস্টে অসুস্থতার জন্য মিলার খেলতে পারেননি দ্বিতীয় ইনিংসে। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসে গলার অসুখে কাবু হয়ে মিলার বিছানায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়া ৯৬ রানে জয়ী হল।

মেলবোর্নের দ্বিতীয় টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকা ৮২ রানে জয়ী হলেও (অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম জয়) কিথ মিলারকে দেখা যায় দৈত্যের ভূমিকায়। তেত্রিশতম টেস্টে 'ডাবল' অর্জন করা এই ম্যাচে মিলার দখল করেন সাতটি উইকেট এবং রান করেন ৮৩; এইচ জে তেফিল্ডের ১৬৫ রানে ১৩ উইকেট লাভ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যেকোন দক্ষিণ আফ্রিকান খেলোয়াড়ের সেরা বোলিং অ্যাভারেজ।

তৃতীয় টেস্টেও (সিডনি) মিলারের ভূমিকা ছিল দুর্দান্ত। অস্ট্রেলিয়া লিণ্ডওয়াল (৪০-৪) ও মিলারের (৪৮-৩) দাপটে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস গুটিয়ে দেয় ১৭৩ রানের মধ্যে। অস্ট্রেলিয়ার ৪৪৩ রানের ইনিংসে আর এন হার্ভের ১৯০ রানের পরেই দুর্ধর্ষ ব্যাটিং পারফরমেন্স দেখান কিথ মিলার (৫৫)। দক্ষিণ আফ্রিকা ২৩২ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে। এই ইনিংসেও মিলার ৩৩ রানে দু' উইকেট লাভ করেন। অস্ট্রেলিয়া জয়ী হয় ইনিংস ও ৩৮ রানে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে মাত্র আটটি টেস্ট খেলে হার্ভে প্রথম অস্ট্রেলিয়ান হিসাবে হাজার রান করেন।

এডিলেড ওভালের চতুর্থ টেস্ট ড্র হয়। লিণ্ডওয়ালের পায়ের পেশী ছিঁড়ে যাওয়ায় এবং কোমরে আঘাত পেয়ে মিলার দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে পারেননি।

অসুস্থ মিলার-লিণ্ডওয়াল জুটি মেলবোর্নের শেষ টেস্টে খেলতে পারেননি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ছয় উইকেটে জয়ী হয়। সিরিজের ফল ২-২।

এরপর ১৯৫৩ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়ে কিথ মিলার ফিরে এলেন সাংঘাতিক ব্যাটিং ফরমে। নটিংহামের প্রথম টেস্টের আগের খেলাগুলিতে মিলারের তিনটে ইনিংস ছিল ২২২ নট আউট, ৪২ রান ও ১৫৯ নট আউট। লণ্ডনের সব কাগজে লেখা হল কিথ মিলার এক মাসের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর খেলায় এক হাজার রান তুলে ফেলার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে খেলাতে মিলার অফ স্টাম্পের বাইরের বল খেলে ক্যাচ আউট হন ২০ রানে এবং ক্রিকেট সমালোচকদের ভবিষ্যতবাণী ফললো না। ওই এক মাসে মিলার আর একটা ইনিংসে মাত্র ৩৯ রান করতে পেরেছিলেন। যাই হোক মিলারের ব্যাটিং দাপট কিন্তু টেস্ট ম্যাচগুলিতেও ছিল।

পাঁচ টেস্টের সিরিজে অস্ট্রেলিয়া একটিতে হারে এবং বাকি চারটি ড্র হয়। এই সিরিজেই মিলার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে উলফ্রেড রোডসের ২,০০০ রান ও ১০০ উইকেটের রেকর্ডে পৌঁছে যান।

নটিংহামের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম উইকেট পড়ে দুই রানে এবং শেষ সাত উইকেট পড়ে ১২ রানের মধ্যে। মাঝে কিথ মিলার (৫৫), অধিনায়ক হাসেট (১১৫) ও এ আর মরিসের (৬৭) দৌলতে চূড়ান্ত ধ্বসের হাত থেকে রক্ষা পায়। ইংল্যাণ্ডের আলেক্স বেডসার ৫৫ রানে সাত উইকেট নিয়েছিলেন। ২৪৯ রানের প্রথম ইনিংসের পর ইংল্যাণ্ড প্রত্যুত্তরে রান করে মাত্র ১৪৪; লিণ্ডওয়াল তার সহযোগী ছাড়াই ৫৭ রানে পাঁচ উইকেট পান। ইংল্যাণ্ডের দুই ইনিংসেই মিলার কোন বল করেননি। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসও শেষ হয় (১২৩ রান), বেডসারের ভয়ঙ্কর ভূমিকার জন্য। বেডসার এই ইনিংসেও সাতটি উইকেট দখল করেন। ম্যাচে তার ৯৯ রানে ১৪ উইকেট নটিংহামে ১৯৩৪ থেকে হয়ে আসা টেস্ট ম্যাচগুলির মধ্যে সেরা বোলিং। দুই দিনের মধ্যে জয়ের জন্য ইংল্যাণ্ডকে মাত্র ১৮৭ রান করতে হবে। কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টিতে শেষ দিন বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত খেলা হতে পারেনি বলেই ম্যাচটা ড্র হয়।

লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাট হাতে মিলারকে দেখা যায় সংহার মূর্তিতে। প্রথম ইনিংসে পাঁচশ রানে আউট হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে মিলার চমৎকার একটি সেঞ্চুরি (১০৯) হাঁকান এবং ম্যাচের শেষ দিনটিকে নাটকীয় গতির দিকে মোড় ঘোরান। নবাগত ডব্লু ওয়াটসন (১০৯) এবং টেস্ট ক্রিকেটের আর এক খ্যাতনামা অল-রাউণ্ডার ট্রেভর বইলি (৭১) দীর্ঘ সময় ক্রীজ আগলে পঞ্চম উইকেটে ১৬৩ রান যোগ করে ইংল্যাণ্ডকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচান। লিণ্ডওয়াল সাত উইকেট এবং বেডসার আট উইকেট পান। কিথ মিলারের চমকপ্রদ সেঞ্চুরিটি যেমন অস্ট্রেলিয়াকে জয়ের পথে পৌঁছে দিয়েছিল তেমনি ওয়াটসন ও বেইলির ইংল্যাণ্ডকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করা—লর্ডস মাঠে দুটোই ঐতিহাসিক।

আলেক্স বেডসারের দুর্ধর্ষ ইন-সুইঙ্গার ও লেটকাটারে অস্ট্রেলিয়ানরা ওল্ড ট্র্যাফোর্ডেও বিব্রত হলেন। ৩১৮ রানের প্রথম ইনিংসে কিথ মিলারের রান ছিল মাত্র ১৭; ইংল্যাণ্ডের ইনিংস ২৭৬ রানের উত্তরে অস্ট্রেলিয়া শেষ সময় পর্যন্ত মাত্র ৩৫ রান তুলতে পেরেছিল আটটি উইকেট হারিয়ে। বৃষ্টি অস্ট্রেলিয়াকে হারের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। জে এইচ ওয়ার্ল্ডের ঘূর্ণি বলের মুখে কোন অস্ট্রেলিয়ানই দাঁড়াতে পারেননি।

হেডিংলের লীডস মাঠে চমৎকার ব্রেকথ্রু বোলিং দেখালেন কিথ মিলার। ১৯০৯ সাল থেকে টসে জয়ী হয়ে অস্ট্রেলিয়া প্রথমবার ইংল্যাণ্ডকে ব্যাট করতে পাঠালো। প্রথম দিন ৯৬ ওভার খেলায় মাত্র ১৪২ রান করেছিল ইংল্যাণ্ড সাত উইকেট হারিয়ে। লিণ্ডওয়াল ও মিলার চমৎকারভাবে উইকেটগুলি ভাগ করে নেন। ইংল্যাণ্ডের ১৬৭ রানের উত্তরে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস শেষ করে ২৬৬ রানে। মিলার ও লিণ্ডওয়াল ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসেও ধ্বস সৃষ্টি করেন। ট্রেভর বেইলির রক্ষণাত্মক লেগ্-থিওরি অস্ট্রেলিয়ার জয়ে বাদ সাধে। ১১৫ মিনিটে ১৭৭ রান করলে অস্ট্রেলিয়া জয়ী হতে পারতো। শেষনেষ তারা ৪ উইকেটে ১৪৭ রান করতে পেরেছিল। ম্যাচে লিণ্ডওয়াল আট ও মিলার ছয় উইকেট পেয়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক জি আর ল্যাংলেকে আউট করে আলেক্স বেডসার বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন সি ভি গ্রিমেটের ২১৬ উইকেটের রেকর্ড ভেঙে।

কেনিংটন ওভালে ছয় দিনের শেষ টেস্টে ইংল্যাণ্ড আট উইকেটে হারিয়ে দেয় অস্ট্রেলিয়াকে। ১৮ বছর ৩৬২ দিনের রেকর্ড সময়ের পর ইংল্যাণ্ড অ্যাসেস ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে। ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার রাবার যুদ্ধে হাটনই একমাত্র অধিনায়ক, যিনি পাঁচটা টেস্টেই টসে হেরে জয়ী হতে পারলেন। বিশটি টেস্টে বেডসার আঠার বার এ আর মরিসকে আউট করেন এবং এস ডব্লু টেস্টের সিরিজে ৩৯ উইকেট দখলের রেকর্ড ম্লান করেন।

এই সিরিজে কিথ মিলার স্লো টার্নিং উইকেটগুলোতে ব্যাটসম্যান বা বোলার হিসেবে খুশি হতে পারেননি। তার আগেকার পর্যায়ের খেলাও আশানুরূপ দেখাতে পারেননি।

পরবর্তী সময়ের জন্য তাই কিথ মিলার তার সেরা ক্রিকেট খেলা উপহার দেবার অপেক্ষায় রইলেন।

১৯৫৪-৫৫ সিরিজে হাটনের ইংল্যাণ্ড দল খেললো অস্ট্রেলিয়ায়। ব্রিসবেনের প্রথম টেস্টে মিলার প্রয়োজন মাফিক খেললেন এবং অস্ট্রেলিয়া ইনিংস ও ১৫৪ রানে জয়ী হল। ম্যাচে মিলার দু'টি উইকেট পেয়েছিলেন এবং একমাত্র ইনিংসে রান করেছিলেন ৪৯; মরিস ও হার্ভে উভয়ের দেড় শতাধিক রানে ৬০১ রানের (আট উইকেটে ডিক্লেয়ার) বড় অংকের ইনিংস গড়েছিল অস্ট্রেলিয়া। কোনো স্লো বোলার ছাড়াই ইংল্যাণ্ড ফিল্ডিং-এ নেমেছিল। পরে আয়ান জনসন, মিলার ও লিণ্ডওয়ালের ক্ষিপ্রতায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস গুটিয়ে যায় ১৯০ রানেই। ফলো অনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যাণ্ড রান করে ২৫৭।

সিডনির দ্বিতীয় টেস্টে মিলার খেলেননি। অস্ট্রেলিয়া ৩৮ রানে হেরেছিল। এফ এইচ টাইসনের ক্ষিপ্রতায় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসগুলিতে ধ্বস নামে। ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসে লিণ্ডওয়ালের একটি বাউন্সারে চোট পেয়েও টাইসন ম্যাচে দশটি উইকেট পান। টেস্ট ক্রিকেটের গোটা শতাব্দীতে লারউড ফার্নেস ও ভোসের পরে চতুর্থ ব্যক্তি হলেন টাইসন যিনি ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেস্ট ম্যাচে দশটা উইকেট পেলেন।

কিথ মিলার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীর আর সব টেস্ট কেন্দ্রগুলির মধ্যে মেলবোর্নে টসে জয়ী হওয়াটাই ম্যাচ জয়ের পক্ষে মস্ত সুবিধার ব্যাপার। ইংল্যাণ্ড অধিনায়ক হাটন যখন টসে জিতে ব্যাটিং বেছে নিলেন তখন কিথ মিলারকে দেখা দিলেন এক দুর্ধর্ষ ভূমিকায়। ইংল্যাণ্ডের মাত্র ২৯ রানের মধ্যে সাংঘাতিক এক ওপেনিং স্পেলে মিলার হাটন এডরিচ ও কম্পটনকে

প্যাভেলিয়নে ফিরিয়ে দিলেন। সবুজ ঘাসের চাদর বিছানো পিচকে মিলার ব্যবহার করলেন খুশিমতো। তার ওপেনিং স্পেল ছিল ৯ ওভার ৮ মেইডেন, পাঁচ রান ও তিন উইকেট। শিউরে ওঠার মতো ব্যাপার।

মিলার, আরচার ও লিণ্ডওয়ালের ধ্বংস কাজের রাস্তাটা বদলে দিলেন কাউড্রে। ইংল্যাণ্ডের ১৯১ রানের প্রথম ইনিংসে কাউড্রে করলেন ১০২ রান। তিনি ব্র্যাডম্যানের রেকর্ডেরও অংশীদার হলেন। এই মেলবোর্নেই ব্র্যাডম্যান ৩২-৩৩ সিরিজে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯১ রানের অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে একাই ১০৩ রান করেছিলেন।

টাইসন ও জে বি স্টেথামের দাপটে ইংল্যাণ্ড ম্যাচ জিতল। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার শেষ আট উইকেট ঝপঝপ পড়ে গেল মাত্র ৩৬ রানে। টাইসন ম্যাচে ৯ উইকেটে ও স্টেথাম সাত উইকেট নিলেন। টাইসনের ৫১ বলে ষোল রান দিয়ে ছয়টি উইকেট লাভ ফাস্ট বোলারদের ক্ষেত্রে সাংঘাতিক ভালো বিশ্লেষণ।

এরপর এডিলেড টেস্ট। রাবার মীমাংসার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ালো। টসে জিতে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে রান করে ৩২৩ মিলার ৪৪ রান। ইংল্যাণ্ডের ইনিংস এগিয়ে যায় ১৮ রানে। টাইসন, স্টেথাম ও আর এপলেয়ার্ডের সাংঘাতিক বোলিং-এর (সকলেই তিন উইকেট করে পান) জন্য অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় মাত্র ১১১ রানের মধ্যেই। জয়ের জন্য ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে দরকার ৯৩ রান। দলের এই চরম বিপদের মুখে মাত্র ২০টা বলেই কিথ মিলার পান হাটন, এডরিচ ও কাউড্রের উইকেট ১৮ রান দিয়ে। প্রথম দিকের তিনজনকে হারিয়েও পি বি এইচ মে যখন স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং ভিত্ত গড়তে শুরু করলেন তখন তাকে চমৎকার একটি ক্যাচে ধরে ফেলেন মিলার; একস্ট্রা কভারে। কম্পটন, বেইলি ও ইভানসের দ্বারা ইংল্যাণ্ড এই ম্যাচে পাঁচ উইকেটে জয়ের আগে কিথ মিলারের একক প্রচেষ্টায় একসময় ভয়ঙ্কর অবস্থায় ছিল চার উইকেট হারিয়ে ৪৯ রানে। ইংল্যাণ্ড প্রথম রাবার জয় করলেন অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এবং অ্যাসেসও পুনরুদ্ধার করলেন।

সিডনিতে ড্র হওয়া শেষ টেস্টে মিলার শুধু ৪৭ রান করতে পেরেছিলেন।

(চলবে)



ওরা উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন



এয়ারপোর্ট অথরিটির ডাইরেক্টর নীরদ সিনহা রায় ইণ্টালী এ সি'র সম্পাদক এস কে ব্যানার্জিকে ৩০০১ টাকার চেক দিলেন / পাহাড়ী রায়চৌধুরী

স্টাফ রিপোর্টার: বয়স এক বছর। উদ্দেশ্যের দিকে এরই মধ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে অল এয়ার-লাইন্স রিক্রিয়েশন ক্লাব। '৭৮ সালের ৩ নভেম্বর জন্ম। উদ্দেশ্য খেলাধূলাকে, খেলাধূলা যারা করেন তাদের সাহায্য করা, উৎসাহিত করা। প্রধানত, আর্থিক দিক থেকে।

ক্লাবের তরফ থেকে ক'দিন আগে এক অনুষ্ঠানে এণ্টালি অ্যাথলেটিক্স ক্লাবকে দেওয়া হল ৩০০১ টাকা। ক্লাব ওই টাকা কাজে লাগাবেন পঙ্কজ গুপ্ত স্মৃতি হকি কোচিং ক্যাম্প পরিচালনার জন্য। এয়ারপোর্ট অথরিটির ডাইরেক্টর নীরদ সরকার ক্লাবের সম্পাদকের হাতে ওই টাকা তুলে দেন।

কলকাতায় যারা অ্যাথলেটিক্সের প্রশিক্ষণ দেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য সুস্থিত সিনহা। ক্লাব তার এই কাজের ব্যয়ভার লাঘব করবার জন্য ১০০১ টাকা শ্রীসিনহাকে দেন। কলকাতা বিমানবন্দরের সিনিয়র সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (কাস্টমস) রমেন লাহিড়ীর কাছ থেকে ওই একই অনুষ্ঠানে শ্রীসিনহা টাকাটি নেন।

আগামী ৮ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় বসছে এশিয়ান কবাডির আসর। অনেক টাকার ব্যাপার। আয়োজক পশ্চিমবঙ্গ কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের আর্থিক সামর্থ্য সীমিত। ক্লাব তাই অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অচিন্ত্য সাহার হাতে তুলে দিয়েছে ২০০১ টাকার একটি চেক। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের এয়ারপোর্ট ম্যানেজার পি এস পিল্লাই ওই অনুষ্ঠানেই শ্রীসাহার হাতে চেকটি দেন।

ক্লাবের দুই যুগ্ম-সম্পাদক সমরেশ বসু রায় ও কে ডি বাসু জানালেন, 'এটা আমাদের প্রথম পদক্ষেপ। ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে আরও বেশি পরিমাণে সাহায্য দেবার।'

অর্থ কোথা থেকে আসে? ওরা জানালেন, প্রতি বছরই ক্লাবের পক্ষ থেকে একটি বড় বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তার থেকে যে অর্থ পাওয়া যায় তাই দেওয়া হয় বিভিন্ন সংগঠনকে। কাদের দেওয়া হবে তা ঠিক করবে অ্যাডভাইসারি কমিটি। এই কমিটির চেয়ারম্যান কলকাতা পুলিসের ডি সি (হেডকোয়ার্টার) বি কে সাহা।

ক্লাবের এই মুহূর্তে নিজস্ব কোন আস্তানা নেই। 'এদিক থেকে থাই ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজ খুব সাহায্য করেছে ওদের বিমানবন্দরের একটি ঘর ব্যবহার করতে দিয়ে।'

সম্পাদক শ্রীবাসু রায় জানালেন, আগামী মার্চ মাসে কলকাতায় বিরাটাকারে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আশা, এর থেকে বেশ কিছু অর্থ পাওয়া যাবে। ●

ক্রিকেটের ছড়া

হাননান আহসান



ভোজু আর ভোগু
খেলবে ক্রিকেট,
তাই সকাল থেকে
জুড়েছে ডিবেট।

আক্কেল খাট্টা
মারবো দুড়ুম,
অমনি-পড়্‌বি-
মাটিতে গুড়ুম।

ভোগু হেসে কয়
ঃ মারবো কাটিং,
ছিটকে যাবি হ্যাঁ
এমন ব্যাটিং।

করবে না কেউ
বলটা উঁচিয়ে
ব্যাটিং-এ ওস্তাদ
ছপ্পর ফাটিয়ে।



সোয়েটার বুনে দিতে হবে? ইডেনে পাকিস্তান টেস্টের সময় বুনে দেব খেলা দেখতে দেখতে

কার্টুন: পিজি



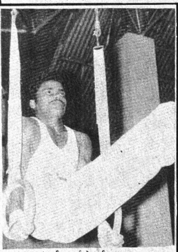
স্কুল-হকিতে রাজ্যের সেরা দল খালসা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল দল / শংকর নাগ দাস



ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার পূর্বাঞ্চল ফুটবল চ্যাম্পিয়ন কলকাতার ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এমপ্লয়িজ স্পোর্টস ক্লাব / শংকর নাগ দাস



অধ্যক্ষ হেরম্ব মৈত্র শিল্ড বিজয়ী সিটি (কমার্স) ফুটবল দল / শংকর নাগ দাস



নবম আন্তঃরেল জিমন্যাস্টিক্সে রিং'এ প্রথম রবীন দাস (চিত্তরঞ্জন) / শংকর



বিশ্ব ছাত্র-দাবায় সাফল্যের (ব্রোঞ্জ পদক) জন্য আলোখিন চেস ক্লাবের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত বড়ুয়াকে / শংকর নাগ দাস

সংবাদ-চিত্র



নবম আন্তঃরেল জিমন্যাস্টিক্সের প্যারালাল বারে প্রথম সাউথ ইস্টার্নের তারাপদ মুখার্জি / শংকর নাগ দাস



মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বার্ষিক স্পোর্টসে মেয়েদের সেরা রীতা সেন পুরস্কার নিচ্ছেন শ্রীমতী বি কে সাহার কাছ থেকে / অরুণ মুখার্জি

বঙ্কিম কাপ বিজয়ী (১৯৭৯) বরানগর নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দির ফুটবল দল / শংকর



দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া রাগবী প্রতিযোগিতায় বিজয়ী কলকাতা পুলিস দল / অরুণ ব্যানার্জি





ব্রহ্মানন্দ আবার মাঠে ফিরলেন

চিন্ময় বিশ্বাস : ফুটবলে বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ গোলকিপার কে, এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। এপ্রশ্নে বাংলার ফুটবল প্রেমিকরা কিন্তু তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবেন। ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা বলবেন—ভাস্কর গাঙ্গুলিই ভারত সেরা; মোহনবাগান সমর্থকরা বলবেন—প্রতাপ ঘোষের উপরে কেউ নেই। মহমেডান সমর্থকেরা বুক চিতিয়ে বলবেন—'কেন নাসির আমেদের প্রথম নম্বরে আসতে বাধা কোথায়' পাঞ্জাবীরা বলবেন—'সুরজিত সিংই ভারতের শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক।' দক্ষিণ ভারতীয়রা সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠবেন, 'আমাদের সেতুমাধবনের উপরে কেউ নেই।' বোম্বাইয়ের ফুটবল প্রেমিকরা ও কিন্তু ছেড়ে কথা বলবেন না। তাঁদের মতে তাদের ভাস্কর মাইতির হয়ে লড়ে যাবেন। মোদ্দা কথা এটা এমন একটা প্রশ্ন, যার উত্তর খুব সহজে পাওয়া যাবে না।

প্রশ্নটা এমন একজনকে করব ভাবছিলাম যিনি কলকাতার ফুটবলের প্রভাব মুক্ত, ভারতীয় দলের কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন, অর্থাৎ নিরপেক্ষ মতামত দেবেন। এমন একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির সন্ধান বেশ কিছুদিন ধরে করছিলাম। বিগত এশিয়ান গেমস ক্যাম্পে ভাস্কর মাইতিকে দেখেই প্রশ্নটা আমার মনের মধ্যে নাড়াচাড়া বসল। ভাস্করের সঙ্গে পরিচয়টা হতেই প্রশ্নটা করলাম : আপনি তো বর্তমানে ভারতের প্রায় সব গোলকিপারকে দেখেছেন, আপনার মতে ভারতের সেরা গোলকিপার কে? প্রশ্নটা শোনা মাত্রই ভাস্করের ভুরু কুঁচকে গেল। বেশ, কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে উনি ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, এটা এমন একটা প্রশ্ন, যাতে এক একজনের এক একরকম মতামত থাকবে। তবে আমি কিন্তু নিরপেক্ষ মতামত দিচ্ছি, যেটা অন্যের সঙ্গে নাও মিলতে পারে। আমি সারা ভারতের যত গোলকিপারের খেলা দেখেছি, তার মধ্যে গোয়ার ব্রহ্মানন্দ এবং রেলওয়েজের প্রতাপ ঘোষের (বর্তমানে মোহনবাগান) খেলা আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। এদের দু'জনের খেলার ভঙ্গিমা খুবই সহজ ও সরল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা লোক দেখানো শো করে না। তবে ঐ দু'জনের মধ্যে আমি ব্রহ্মানন্দকেই ভারত-শ্রেষ্ঠ অভিহিত করব। কারণ ব্রহ্মানন্দ চটকহীন খেলা খেললেও চিতার মত ক্ষিপ্র। প্রয়োজন ছাড়া ডাইভ মারে না, শুধু ফুটওয়ার্কে বলের লাইনে পৌঁছে যায় বেশীর ভাগ সময়ে। অদ্ভুত সুন্দর ওর ফুটওয়ার্ক। ওর খেলার ধরণ ভারতের আর এক মহান গোলরক্ষক—মুস্তাফার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।'

পুরো নাম ব্রহ্মানন্দ সালগাঁওকার। জন্ম ১৯৫৫ সালের ৬ মার্চ। দাদারা সকলেই গোয়াতেই ফুটবল খেলতেন। এদের অনুপ্রেরণাই ব্রহ্মানন্দের ফুটবল জীবনের বড় সম্পদ। ১৯৭০ সালে প্যানভেল স্পোর্টস ক্লাবের হয়ে গোয়ার প্রথম ডিভিসনে ফুটবল শুরু। ছ'বছর ধরে গোয়ার হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে খেলে আসছেন। ১৯৭৬ ও '৭৭ সালে দু'বার জুনিয়র জাতীয় দলে খেলেছেন।



কলকাতা জাতীয় ফুটবল আসরে ব্রহ্মানন্দ / অরুণ মুখার্জি

এবং '৭৬ ও '৭৭ সালের মধ্যেই ছ'বার সিনিয়র জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন।

ফুটবলার হিসাবে সবচেয়ে ভাল লাগে হরজিন্দার সিংকে। হরজিন্দারের অপূর্ব ক্রীড়াশৈলী ওকে মুগ্ধ করে। কোচ সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দের বক্তব্য 'যত কোচের সংস্পর্শে এসেছি সবাই ভাল কোচ। এ ব্যাপারে আমার কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। যখন যার সান্নিধ্যে এসেছি, তখনই তার নির্দেশ বিনা-দ্বিধায় পালন করেছি।'

আপাততঃ ফুটবল জীবনের সেরা খেলা হিসাবে উনি চিহ্নিত করেন '৭৪-এ গোয়া বনাম পাঞ্জাব ম্যাচ। খেলাটি হয়েছিল জলন্ধরে। পাঞ্জাব সেবার জাতীয় দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ে-পুষ্ট ছিল। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ সেদিন পাঞ্জাব দলের জেতার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

জীবনের স্মরনীয় দিন '৭৭ সালের ভারত বনাম জাম্বিয়ার শেষ টেস্ট ম্যাচ। সেদিন অসাধারণ খেলার পর পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জাম্বিয়ার মেয়র ব্রহ্মানন্দকে 'প্যান্থার' অর্থাৎ 'চিতাবাঘ' আখ্যা দেন। অদ্ভুত লড়াকু মেজাজের পরিচয় দিয়েছিলেন সেদিন। ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিপটে ওই দিনটি চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে।

ব্রহ্মানন্দের সংগীতের প্রতি অপরিসীম আগ্রহ। সময় পেলেই তাই গান শুনতে বসে যান। অবসর সময় কাটানোর আর একটি উপকরণও ওর আছে, সেটা বই। বেশ কিছুদিন অসুস্থতার জন্য জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেননি। এমন কি '৭৮-এর ব্যাংকক এশিয়ান গেমসেও নয়। সুস্থ হয়ে উনি আবার জাতীয় দলে ফিরে এসেছেন। অক্টোবরে ভারতীয় দলের সঙ্গে আরব সফরেও ছিলেন।

গোষ্ঠ পাল ফুটবলে বিজয়ী রাজস্থান ও খিদিরপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেদিনীপুর অ্যাথলেটিক ক্লাবের পরিচালনায় স্থানীয় অরবিন্দ স্টেডিয়ামে গোষ্ঠ পাল স্মৃতি ফুটবলের খেলা হলো। ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কলকাতার খিদিরপুর ও রাজস্থান ক্লাব। সেমিফাইনালে খিদিরপুর সালকিয়া ফ্রেণ্ডসকে দ্বিতীয়ার্ধের ৩০ মিনিটে শ্রীকুমার হাজরার দেওয়া একমাত্র গোলে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। অপরদিকে রাজস্থান ক্লাব কলকাতার টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে ওই একই ফলাফলে পরাজিত করে। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে গোল করেন কৃষ্ণগোপাল মুখার্জি। গত ৩ ডিসেম্বর অরবিন্দ স্টেডিয়ামে কলকাতার প্রথম ডিভিসনের দুটি দল যখন চূড়ান্ত খেলার জন্য মুখোমুখি হল তখন হাজার হাজার দর্শক তাদের প্রিয় দু' দলকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানায়। উভয় দলই বেশ কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করে গোলশূন্য অবস্থায় খেলা শেষ করে, তাদের যুগ্মবিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

এ কেমন সাঁতারের আসর!



চন্দননগর প্রগতি সংঘের রত্না চক্রবর্তী ও মালা সিংহ

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ জেলাভিত্তিক একটা সাঁতার প্রতিযোগিতার নমুনা দেখলাম। ত্রিপলের একটা ছাউনির নিচে কিছু সংখ্যক চেয়ার পাতা। যার অধিকাংশই খালি। যোগদানকারী সাঁতারু ও জেলা সাঁতার সংস্থার কয়েকজন কর্মকর্তা ছাড়া জলাশয়ের চারপাশে কোন দর্শকের মুখ দেখতে পেলাম না।

চু'চুড়া সুভাষ সরোবরে হুগলি জেলা সাঁতার প্রতিযোগিতার ওই অবস্থা দেখে সেদিন বিস্মিত হয়েছিলাম। কারণ এই সেদিনও এই জেলার তেরজন সাঁতারু সর্বভারতীয় বয়স-ভিত্তিক সাঁতারে বহু রেকর্ড সৃষ্টি করে সোনা, রুপো জিতে আনলো। তাহলে জেলা সাঁতারের এই অবস্থা কেন? না আছে সাঁতারুদের মধ্যে তেমন উৎসাহ, না আছে সাধারণ মানুষের আগ্রহ। যেন দায়সারা গোছের ব্যাপার। মেয়ে প্রতিযোগীর অভাবে কয়েকটি ইভেন্ট তো সেদিন বাতিল করে দিতে হল। এক একটা ক্লাব দু'জন একজন করে প্রতিযোগী পাঠিয়েছিল।

ব্যাপারটা নিয়ে একজন প্রবীণ সাঁতারুর সঙ্গে সেদিন আলোচনা করেছি। তার বক্তব্যের মূল কথা হচ্ছে অর্থনৈতিক অবস্থা তো আছেই। কিন্তু সেই সঙ্গে উৎসাহ সৃষ্টি করায় জেলা সাঁতার সংস্থার ব্যর্থতাও আছে। তিনি বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, 'আচ্ছা বলুন তো জেলায় এত ভাল ভাল সাঁতারু রয়েছে, জেলা সংস্থার পক্ষে তাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা কি সম্ভব হয়েছে। আর জেলা সংস্থার এই হাল হলে ক্লাবগুলিই বা কত কি করবে।'

এবারের প্রতিযোগিতায় গ্রামের একটি ক্লাব নালিকুল স্বামীজী সংঘের ছেলেরা সবচেয়ে বেশী সাফল্য পেয়েছে। ওদের দলে কোন মেয়ে ছিল না। তবু ওরাই সর্বোচ্চ সংখ্যক (৬২ পয়েন্ট)পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ওদের বিশ্বজিৎ সাঁতরা পনের বছর বয়সের নিচের বিভাগে একশো মিটার ফ্রি স্টাইল, ব্রেস্ট স্ট্রোক এবং চারশো মিটার ফ্রি-স্টাইলে প্রথম হয়। ছেলেদের পনের বছরের ওপর বয়সীদের বিভাগে অশোক সাঁতরা দিলীপ বাগুই, প্রণব সাঁতরা বিভিন্ন বিষয়ে সফল হয়েছে।

মেয়েদের বিভিন্ন বিভাগে একাধিপত্য ছিল চন্দননগর প্রগতি সংঘের। সিনিয়র মেয়েদের বিভাগে প্রগতি সংঘের মালা সিংহ দুটি বিষয়েই প্রথম হয়। আবার ওদেরই শ্যামলী পাল দুটি বিষয়েই হয় দ্বিতীয়। তের বছর বয়সী মেয়েদের বিভাগে ওদের রত্না চক্রবর্তী সবোচ্চ সংখ্যক পয়েন্ট লাভ করে। রত্না একশো মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে ও ব্যাক স্ট্রোকে হয় প্রথম এবং ফ্রি-স্টাইলে হয় দ্বিতীয়। এগারো বছর নিচের বয়সী মেয়েদের বিভাগে চাতরা সুইমিং ক্লাবের বুলা চৌধুরী এবং রিষড়া সুইমিং-এর উৎপলা আস সাফল্য পেলেও মেয়েদের বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ন হয় প্রগতি সংঘ ■

জাতীয় ব্রিজ পাটনায় ঃ প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছে

পাটনা থেকে সমীর সেনগুপ্ত ঃ ডিসেম্বরে বিহারের রাজধানী পাটনায় এ বছরের জাতীয় ব্রিজ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সমস্ত ব্যবস্থাদি একরকম চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গেছে। বিহারের নিউ সেক্রেটারিয়েটের সামনে নবনির্মিত টেকনিকাল সেক্রেটারিয়েট ভবনে মিঠে মিঠে শীতের আমেজে ডিসেম্বরের এই জাতীয় ব্রিজ যে খুব আকর্ষণীয় হতে যাচ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ক্লোজ রুম এবং ওপন রুম যাতে একেবারে আলাদা থাকে সেজন্যে ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তাসের আকর্ষক হাত-গুলো বিদ্যুৎ চালিত দৃশ্যপটে দেখানোর ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। সর্বোপরি শ্রীকণ্টক এই প্রতিযোগিতায় ডাইরেক্টর পদ গ্রহণে স্বীকৃত হয়েছেন। কনভেনশনচ্যুত যে কোনোরকম খেলায় কোনো দলের আপত্তি উঠলে শ্রীকণ্টক সে বিষয়ে মীমাংসার ব্যাপারে সুবিদিত।

প্রতিযোগিতার বিশেষ আকর্ষণ কলকাতার ভবানীপুর কার্ড ক্লাব। তাছাড়া দেশের নানা স্থান থেকে যে এবার যথেষ্ট সংখ্যায় প্রতিযোগী দলের সাড়া পাওয়া যাবে, এরকম আভাস মিলেছে। গতবছর এলাহাবাদে আয়োজিত জাতীয় ব্রিজ প্রতিযোগিতায় সাড়া জাগানো রাউরকেল্লা দলটির জন্য এখানকার তাস-ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। এরা রিলে সিস্টেমে খেলে গতবছর বড় বড় দলের অবস্থা কাহিল করে ফেলেছিলেন, কিন্তু একটি দলের সঙ্গে খেলাকালীন তাদের রিলে সিস্টেম সম্বন্ধে পরিষ্কার করে বোঝাতে বললে এই তরুণ দলের খেলোয়াড়েরা একটু হকচকিয়ে যান এবং পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পারেন না। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে ডাইরেক্টরকে ডাকা হয় এবং তিনিও এই নতুন অনভিজ্ঞ দলটির কাছ থেকে সঠিক উত্তর না পেয়ে শেষ পর্যন্ত যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাতে দর্শকদের মধ্যে থেকে বিশেষ প্রতিবাদ ওঠে। যাই হোক রাউরকেল্লার এই দলটির খেলা গতবছর সকলের মনে সাড়া জাগিয়েছিল। তাই এ-বছর এখানেও তাদের জন্য তাস-ভক্তদের এত আগ্রহ।

বিহার রাজ্য ব্রিজ প্রতিযোগিতা

এবারকার বিহার রাজ্য ব্রিজ প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় মুঙ্গের শহরে। এটি ছিল নবম প্রতিযোগিতা, এর উদ্যোক্তা ছিলেন মুঙ্গের ডিস্ট্রিক্ট ব্রিজ অ্যাসোসিয়েশন। এখান-কার গোয়েঙ্কা সেবা সদনে মহাসমারোহে এই খেলা হয়। চারদিনব্যাপী এই প্রতিযোগি-তার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক পি এন শর্মা।

ডুপ্লিকেট টিম অফ ফোর প্রতিযোগিতায় জামশেদপুর দল পাটনার বিরুদ্ধে টেক্কা দেয়। এই দলে ছিলেন এস এম শাদিক (অধিনায়ক) টি এন স্বামী, এম কে অম্বষ্ঠ, এম কে বসু, জি এন সিন্‌হা ও রহমান। পাটনার বি পি ভার্মার দল রানার্স আপ হয়। এই দলে স্বয়ং বি পি ভার্মা ছাড়াও ছিলেন মনীশ চ্যাটার্জি, এস পি ওয়াদেরা, বি কে জায়ুয়ার, এস কে সিন্‌হা এবং বিজয় কুমার। উল্লেখযোগ্য যে বি পি ভার্মা জাতীয় ব্রিজ কমিটির সভাপতি এবং মনীশ চ্যাটার্জি সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন।

প্রগ্রেসিভ ইভেন্ট প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন সিন্দ্রীর এ কে মৈত্রের দল। দ্বিতীয় স্থান বি বি লালের নেতৃত্বে রাঁচির হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন টিম।

সর্বশেষ ইভেন্ট ছিল পেয়ারস প্রতি-যোগিতা। এতে পাটনার বি পি ভার্মা ও বি কে জায়ুয়ার মাস্টার পেয়ার বিবেচিত হন। দ্বিতীয় স্থানও অধিকার করে পাটনার দল, যাতে ছিলেন ডি মুন্সী ও শ্রীপুরকায়স্থ।

যে ক'টি দল ব্রিজ প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণ করেছে, নিঃসন্দেহে জাতীয় প্রতিযোগি-তায় এরা সকলেই খেলবে। এছাড়াও শুধু পাটনা থেকেই আরো অন্তত দশটি দলের অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা আছে।

পাটনার প্রাক্তন খেলোয়াড় বাদল সেনগুপ্ত এখন কলকাতায়। তিনি কলকাতার কোনো একটি দলের হয়ে ডিসেম্বর মাসে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। এখানকার ব্রিজ-ভক্তরা তার খেলা দেখার জন্যও উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন।

২৮.১১.৭৯

মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিন্টার্স, ৭৭/২/১, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং ইত্যাদি প্রকাশনী, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন ২৭-৩৩১৬, ২৭-২১৬৯ থেকে প্রকাশিত।

জয় ফুটবল জয়

আলেখ্য : ভাল্টার নয়গেবাউয়ার

অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত



Registration No. 30198/77 KHELAR AASAR 21st December 1979 WB/CC—334/77 Rs. 1.50



মজিদ খাঁ / সন্তোষ ঘোষ